য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ

প্রথম খণ্ড : ভূমিকা : ১৬ বৈশাখ ১২৯৮

দ্বিতীয় খণ্ড : ৮ আশ্বিন ১৩০০

পরিশিষ্ট-সহ

একত্র প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক

প্রথম খণ্ডের

বিজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধটি চৈতন্য-লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়। আমার ইংলন্‌ড্‌-যাত্রার ডায়ারির ভূমিকা-স্বরূপে ইহা রচিত হয়— কোনো কারণ-বশতঃ ইহাকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। ডায়ারি-অংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৬ বৈশাখ
১২৯৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
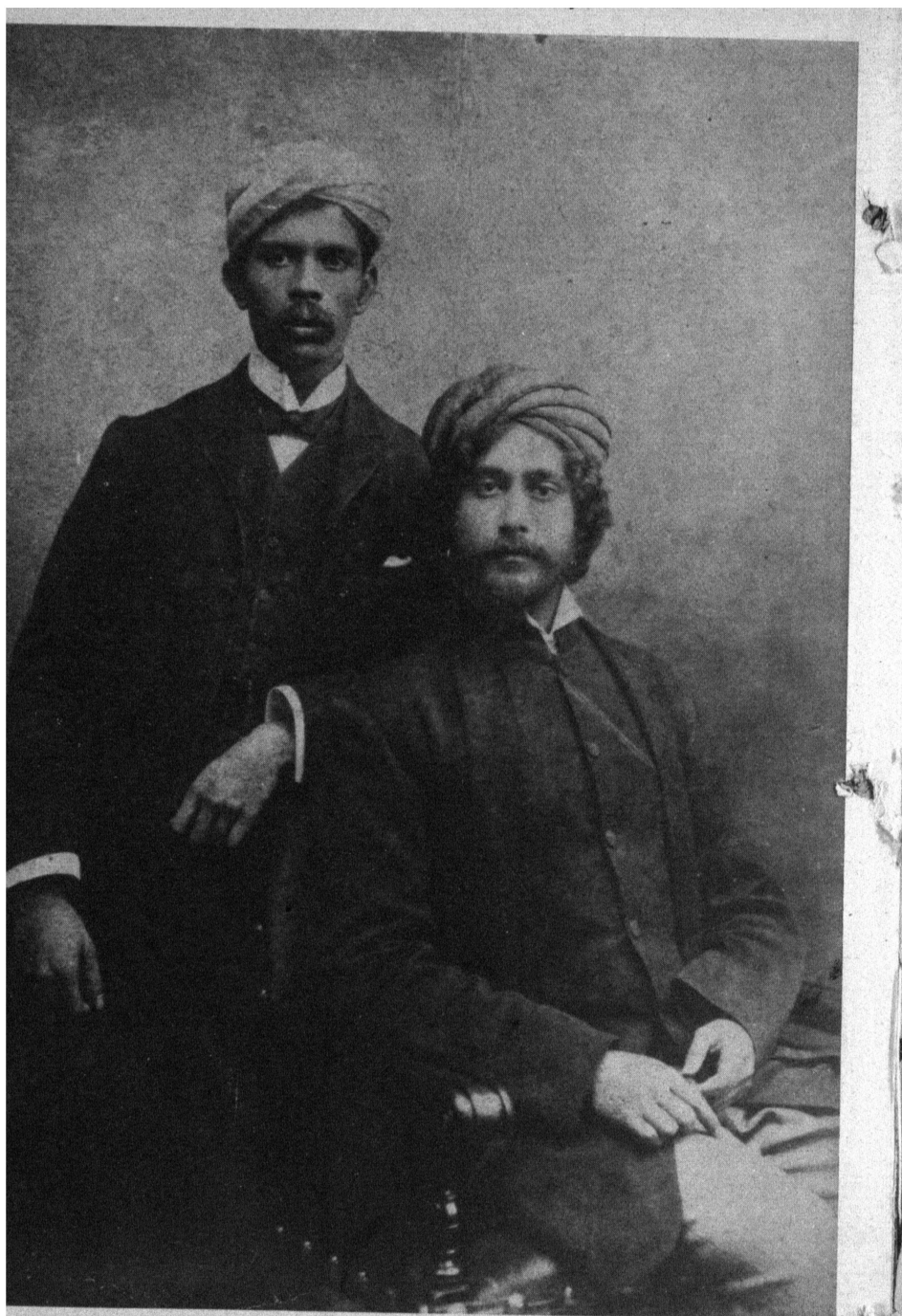
বিলাতে লোকেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

১৮৯০

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত
সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ স্মরণোপহার-স্বরূপে
উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

পরিশিষ্ট

অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতার ঠিক মাঝখানটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একবার তার আঘাত আবর্ত এবং উন্মাদনা, তার উত্তাল তরঙ্গের নৃত্য এবং কলগীতি, অট্টহাস্য করতালি এবং ফেনোচ্ছ্বাস, তার বিদ্যুৎবেগ, অনিদ্র উদ্যম এবং প্রবল প্রবাহ সমস্ত শিরা স্নায়ু ধমনীর মধ্যে অনুভব করে আসব। বহুকাল তীরে বসে বসে বালির ঘর গড়ছি এবং ভাঙছি, এবং ভাবছি, ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে অনেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সমুদ্র-মন্থন সমাপন করে এলেন; এমনি উৎসাহ যে শুষ্কতীরে ফিরে এসেও তাঁরা হস্তপদ-আস্ফালন কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছেন না। আমিও তাই দেখে কৌতূহলবশতঃ একদিন অপরাহ্ণে ঐ তরঙ্গিত অগাধ রহস্যরাশির মধ্যে আনন্দে অবতরণ করেছিলুম, মুহূর্তের মধ্যে খুব খানিকটা নাড়াচাড়া হাবুডুবু এবং লোনা জল খেয়ে অচিরাৎ উঠে এসেছি। এখন কিছুদিন ডাঙার উপরে সর্বাঙ্গ বিস্তারপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করে রোদ পোহাব মনে করছি।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর সকলে কার্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি; আমরা আমাদের পুরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তাফা দিয়ে পেন্‌সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নূতন রাজার রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যে রকম খেটে মরছে এবং খাজানা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে।

অতএব চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো, ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাকলে আর চলবে না ; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো, পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব মানব -রাজার রাজস্ব দাও ; কালেজে পড়ো, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাকরি করো।

উঠেছি তো, চলেওছি, দেখাচ্ছি আমরা খুব কাজের লোক— কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা নিরাশ্বাস, কতটা নিরুদ্যম!

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে! আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ ক'রে, কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে, সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসে ছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময়ে কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে! পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে!

মনে করো আমাদের চতুর্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরও দুর্গম হত তা হলে একদল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত

বেষ্টনের মধ্যে স্থির শান্তভাবে একপ্রকার সংকীর্ণ পরিপূর্ণতা -লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা বড়ো একটা জানতে পেত না এবং ভূগোলবিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাকত; তাদের বিজ্ঞানশাস্ত্র বিচিত্র কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা বৃহৎ জগৎ থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যেত না; কেবল তাদের কাব্য, তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের ধর্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব অপূর্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পেত; তারা যেন পৃথিবী-ছাড়া আর-একটি ছোটো গ্রহের মধ্যে বাস করত; তাদের ইতিহাস, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সুখ সম্পদ তাদের মধ্যেই পর্যাপ্ত থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়, সে কেবল নিস্তরঙ্গভাবে প্রভাত সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান প্রবাহে, পরিবর্তন-কোলাহলের কেন্দ্রস্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রণরঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে খুব একটা শক্তরকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে, কিন্তু নির্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে যে কোনো রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে বলব!

এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতার অবসর কোনো জাতিই পায় নি; মনে হয় কেবল ভারতবর্ষই এক কালে দৈবক্রমে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছিল এবং অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করেছিল। জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম; যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা-যে কোনো নূতন সত্য এবং

কোনো নূতন আনন্দ লাভ করেন নি তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল— তার মধ্যে এক অপরূপ মানসিক সভ্যতার গোপন পরীক্ষা চলছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আল্‌কেমিতত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্রযোগে চিরজীবনরস (elixir of life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা -সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন -লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্', এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তার থেকে কী হতে পারত কে জানে! আল্‌কেমি থেকে যেমন ব্যবহারিক কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয়েছে তেমনি তাঁদের সেই তপস্যা থেকে মানবের কী-এক নিগূঢ় নূতন শক্তির আবিষ্কার হতে পারত তা এখন কে বলতে পারে!

কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। এখনকার নবীন দুরন্ত সভ্যতার মধ্যে এই পরীক্ষার তেমন প্রশান্ত অবসর আর কখনো পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে! একটি জীর্ণ তপস্বী; বসন নেই, ভূষণ নেই, দেহে বল নেই, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নির্জন আশ্রমের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন অন্তরের তেজে তেজস্বী বাহিরে সে কী দরিদ্র, কী দুর্বল! এই-সমস্ত বলিষ্ঠ কর্মপটু উৎসাহী

ধনসম্পদ্‌শালী নবযুবকদের মধ্যে এসে আজ তার কী দুর্দশা, কী লজ্জা! সহসা দেখলে সে কী নিরুপায়, নিঃসহায়; বহুকাল মনোযোগ না দেওয়াতে পৃথিবীর বৈষয়িক বিষয়ে ক্রমে তার অধিকার কত হ্রাস হয়ে গেছে! সে যে কথা বলতে চায় এখনো তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তগম্য পরিণাম নেই।

অতএব, হে বৃদ্ধ, হে চিন্তাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো-- পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো অথবা দিবাশয্যায় পড়ে পড়ে আপনার পুরাতন যৌবনকালের প্রতাপ ঘোষণা -পূর্বক জীর্ণ অস্থি আস্ফালন করো। দেখো, তাতে তোমার লজ্জা নিবারণ হয় কি না।

কিন্তু আমার ওতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র খবরের কাগজের পাল উড়িয়ে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে যাত্রা আরম্ভ করতে আমার সাহস হয় না। যখন মৃদু মৃদু অনুকূল বাতাস দেয় তখন এই কাগজের পাল গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কখন সমুদ্র থেকে ঝড় আসবে এবং দুর্বল দম্ভ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমন যদি হ'ত— নিকটে কোথাও উন্নতি-নামক একটা পাকা বন্দর আছে সেইখানে কোনোমতে পৌঁছলেই তার পরে দধি এবং পিষ্টক, দীয়তাং এবং ভুজ্যতাং, তা হলেও বরং একবার সময় বুঝে আকাশের ভাবগতিক দেখে অত্যন্ত চতুরতা -সহকারে পার হবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই, ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল, তখন কি বসে বসে কেবল ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজের নৌকা নির্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়?

অথচ তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে— চতুর্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম, তখন আমারও মন নেচে ওঠে ; তখন ইচ্ছা করে বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন করে একেবারে বাহির হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই রিক্ত হস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়! হৃদয়ে সে অসীম আশা, জীবনে সে অশ্রান্ত বল, বিশ্বাসের সে অপ্রতিহত প্রভাব, সে নিষ্ঠা, সে সত্যপ্রিয়তা, মিথ্যার প্রতি সে বিজাতীয় ঘৃণা কোথায়! অবশেষে হবে এই— গৃহও ছাড়ব, পথে চলবারও শক্তি থাকবে না। তার চেয়ে পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাসই ভালো, এই ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।

তখন বসে বসে মনকে এই বলে বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারি নে, কিন্তু ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে দেখা যাক পৃথিবীর এই আধুনিক নবসভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা দেখে আমাদের ভালোবাসবে, কবে আমাদের দুর্বলতা দেখে অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের উন্নতিযৌবনের প্রখর বলাভিমান এবং জ্ঞানাভিমান কালক্রমে নম্র হয়ে আসবে এবং আমাদের স্নেহশীলতা দেখে আমাদের প্রতি স্নেহ করবে, আমাদের প্রেমপরায়ণ হৃদয়ের প্রভাবে মানবপরিবারের মধ্যে একটুখানি সমাদরের স্থান লাভ করতে পারব।

গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা দেখে আপাতত সে দিন কল্পনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আচ্ছা নাহয় তাই হল ; দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কী! নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, টাইম্‌সের জগৎ-

প্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল ; আপনা-আপনি ভালোবেসেই কি যথেষ্ট সুখ পাব না ?

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, প্রবলের অত্যাচার আছে, অসহায়ের ভাগ্যে অপমান আছে, কোণে বসে কেবল গৃহকর্ম এবং আতিথ্য করে তার কী প্রতিকার করবে ?

হায়, সেই তো ভারতবর্ষের দুঃসহ দুঃখ ! আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব ? রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ! যিশু খৃস্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্বর কাঠিন্যকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে ! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব ? সভা ক'রে ? দরখাস্ত ক'রে ? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে কাল একটা তাড়া খেয়ে ? তা কখনোই হবে না।

তবে, প্রবলের সমান প্রবল হয়ে ? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল— যখন এই দুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি, তখন কি আর আশা হয় ? তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি। পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি, ভাণ না করি। অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ ভাণকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে, মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃত অবস্থাটা কী তাই আমি দেখতে চেষ্টা করছি। তা দেখতে গেলে যে পুরাতন বেদ পুরাণ সংহিতা খুলে বসে নিজের মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ

করে একটা কাল্পনিক বর্তমান রচনা করতে হবে তা নয়, কিম্বা অন্য জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাযোগে আপনাদের বিলীন করে দিয়ে আমাদের নবশিক্ষার ক্ষীণভিত্তির উপর প্রকাণ্ড দুরাশার দুর্গ নির্মাণ করতে হবে তাও নয়; দেখতে হবে এখন আমরা কোথায় আছি। আমরা যেখানে অবস্থান করছি এখানে পূর্ব দিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিম দিক থেকে ভবিষ্যতের মরীচিকা এসে পড়েছে। সে দুটোকেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সত্য-স্বরূপে জ্ঞান না করে একবার দেখা যাক আমরা যথার্থ কোন্ মৃত্তিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি। এত প্রাচীন যে, এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে; মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে: সেইজন্যে ভ্রম হচ্ছে যেন এ নগর মানব-ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্ন-রেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তি-ছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদ্বর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। এক দিক থেকে এ'কে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে এ'কে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্য-মর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটাভারগ্রস্ত শাখা প্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকা-ভিত্তির মধ্যে শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহা-ছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাই বোনের মতো নির্বিরোধে

আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়া-কুঞ্জ নির্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম। জগতের মধ্যাহ্নসূর্যালোক ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কেবল ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখাসংকটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্মরের মতো মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে; অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা এক সঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেহ অলস ভক্তিভরে হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার ভগ্নভিত্তি কি তোমাদের কল-কারখানা তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবদের কারাগার নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে দিতে পারো বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এই নিশ্চেষ্টনিবিড় মহা নগরারণ্য ভেঙে গেলে সহস্র মৃতবৎসরের যে-একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য

এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে!

এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিকচিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারও সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতি প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য অনেক নূতন সুবিধা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধাকে এবং অসুবিধাকে, প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে স্বহস্তে নূতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহ সংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রুপক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে, কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে আমরা ধুতিটি চাদরটি প'রে অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে বিচরণ করি, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই, ছায়ায় বসে তাস পাশা খেলি, যা-কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, যা-কিছু কার্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক দূর হয় না, এবং এরই উপর কোনো ছেলে যদি শিকিমাত্রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তা হলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি: সর্বমত্যন্তং গর্হিতং।

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই-তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বলছ, 'ওঠো ওঠো—

তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমচ্ছিলে বলে যে সমস্ত সংসার ঘুমচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজছে— এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্মের সময়।'

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে 'কোথায় কর্ম' 'কোথায় কর্ম' করে গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, এবং ওরই মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় স্ফীতস্বভাবের লোক তারা পাশ-মোড়া দিয়ে বলছে, 'কে হে! কর্মের কথা কে বলে! তা, আমরা কি কর্মের লোক নই বলতে চাও! ভারী ভ্রম! ভারতবর্ষ ছাড়া কর্মস্থান কোথাও নেই। দেখো-না কেন, মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্যবর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে! অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্মের লোক! অতএব আমাদের আর কর্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ করো— তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতিস্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অমনি আর-একবার ঘুমিয়ে নিই।'

এই রকম করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক ভাবে, ঈষৎ উন্মীলিত নিদ্রাকষায়িত নেত্রে, আলস্যবিজড়িত অস্পষ্টরুষ্ট হুঙ্কারে জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে; এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি -সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং

নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে, সেই হতভাগ্যেরা বারম্বার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে—

'হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ, এখনো তো তার শেষ হয় নি, এখনো তো তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয় নি, মানব-অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার তো কোনোটারই মীমাংসা হয় নি।

'তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি ? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে এ'কে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ ? তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

'আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট -সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি। যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

'ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের

উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন একদিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে? আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেই রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যে রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেই রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাত-সমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

'যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ, অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি এই কথাই ভালো।'

কিন্তু মানুষে থাকতে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করছে।

তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে—একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে

কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও —পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।

অতএব আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারও কিছু বলবার নেই। তবে, সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এই রকম ভাবে করি যে— পূর্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণতঃ খাটে বটে, কিন্তু আমরা ওরই মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে অনেক দিন খাটে নি। যেমন, মোটের উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাকবার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি-অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না, তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে, কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে। অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে দীর্ঘজীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমরা বহু যত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্যোগ করেছিলুম।

মনে হয় যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্বাসিত ক'রে এমন একটা মধ্য-আকাশে তুলে রাখা

তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিম্বা কালেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে — তাদের পক্ষে এ রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ যোগ্যতর মান্যজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসংগত, হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি প'রে মাটি মেখে ছাতি ফুলিয়ে চলে বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা বাহবা করে— তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা, এবং এণ্ট্রেন্স্ পর্যন্ত পড়ে আজ পাঁচ বৎসর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস : সেও যদি লেংটি পরে, ধূলো মাখে এবং উঠতে-বসতে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমার বাবা পালোয়ান', তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক আত্মীয় বন্ধুরা তার জন্য সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব হয় সত্যই তপস্যা করো, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্যভার ছিল। সেই কার্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্য তাঁরা আপনাদের চারি দিকে কতকগুলি আচরণ-অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধা মাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাকতে পারেন না এবং ভূতপূর্ব অ্যাটর্নির আপিসে যদি

বিশেষ-কারণ-বশতঃ ময়রার দোকান খুলতে হয় তা হলে কি চৌকি টেবিল কাগজ পত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে?

বর্তমান কালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ধর্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত নন। তাঁরা অধিকাংশই চাকরি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখি নে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনো কার্যবৈষম্য দেখা যায় না। এমন অবস্থায় ব্রহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকার কোনো সুবিধা কিম্বা সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কিন্তু সম্প্রতি এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম যে কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোনো কালেই দৃঢ় ছিল না, তাঁরাও কোনো-এক অবসরে পূর্বোক্ত গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন— এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতঃই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাঁদের উপর থেকে আচার বিচার মন্ত্র তন্ত্রের সহস্র বন্ধনপাশ প্রত্যাহরণ করে নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতা-তন্তু-জালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করছেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করছেন। পূর্বে যে-সকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

অতএব বোঝা উচিত এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা

এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে খুঁত খুঁত ক'রে, বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধ'রে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না— যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, আর্যজনের কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসারতা, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার, এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করে মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়ে-মেজে ঢেকে-ঢুকে অন্য-সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা ক'রে আমরা যে রকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে--- এই রকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্যা হয়ে আসে।

জড় পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবার জন্য নির্মল স্ফটিক -আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন আমরা যে একটি আশ্চর্য আর্য পবিত্রতা লাভ করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা অতি যত্নে রক্ষা করবার যোগ্য; সেইজন্যই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে থাকি।

এ সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। প্রথমতঃ, আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্যায় বিচার,

অমূলক অহংকার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানব-ঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি?— আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে 'বসুধৈব কুটুম্বকং'। অত্যন্ত পরুষভাষী রুক্ষস্বভাব ব্যক্তিও নিজ আচরণের প্রশংসাচ্ছলে বলতে পারেন, 'আমার হৃদয় নিরতিশয় উদার, কারণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকেও আমি সহজেই শ্যালক সম্ভাষণ করে থাকি এবং সে হিসাবে গণনা করে দেখতে গেলে প্রায় আমার বসুধৈব কুটুম্বকং।' শাস্ত্রে কী আছে, এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতঃই মানবঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না এবং কোনো-একটি জাতির আপামর সাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কি না তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর-একটি কথা— জড়পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কলঙ্কিত হয়: শখের পোষাকটি প'রে যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। পাছে ধুলো লাগে, জল লাগে, কোনো রকম দাগ লাগে, অনেক সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোষাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় পাছে এর ছোঁওয়া লাগলে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগলে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোষাকি পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কী বিষম বিপদ! জনসমাজের রণক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ অতি পরিপাটী পবিত্রতাকে সামলে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় ব'লে শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ করে আনে; আপনাকে কাপড়টা-

চোপড়টার মতো সর্বদা সিন্ধুকের মধ্যে তুলে রাখে— মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎ-পরিমাণে উপেক্ষা না করলে চলে না। অত্যন্ত রূপপ্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধুলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং ননীর পুঁতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে; ভুলে যায় যে, বর্ণসৌকুমার্য সৌন্দর্যের একটি বাহ্য উপাদান, কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি— জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক, সুতরাং তাকে ঢেকে রাখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত আত্মা জ্ঞান না করো, যদি সে জীবন্ত আত্মা হয়, তবে কিয়ৎপরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে, তার বল-উপার্জনের উদ্দেশে, তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বোঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতাপ্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোওয়াটি বসাটির ইদিক ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকল প্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্যনাশক।

কিন্তু হিন্দুধর্ম আমাদের খাওয়া শোওয়া বসা চলাফেরা সমস্ত অধিকার করে আছে এই ব'লে আমরা গর্ব করে থাকি— আমরা বলি আর-কোনো দেশে মানুষের ছোটোবড়ো প্রত্যেক কাজে, সমাজের উচ্চনীচ প্রত্যেক বিভাগে ধর্মের হস্তক্ষেপ নেই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

কারণ, তাতে করে হয় নির্বিকার ধর্মকে চঞ্চল পরিবর্তনের উপর

প্রতিষ্ঠা করা হয়, নয় পরিবর্তনধর্মী সমাজকে অপরিবর্তনীয় ধর্মনিয়মে বদ্ধ করে নির্জীব করে দেওয়া হয়। হয় ধর্ম সর্বদাই টলমল করে, নয় সমাজ চিরকাল হ্রাসবৃদ্ধিহীন পাষাণনিশ্চলতা লাভ করে।

আমরা কী করে খাব, কী করে শোব, কাকে ছোঁব, কাকে ছোঁব না, এর মধ্যেও যদি মানুষের যুক্তির স্বাধীনতা না থাকে-— সমস্ত বুদ্ধি যদি কেবল অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্রীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই নিযুক্ত থাকে এবং ঈশ্বররচিত এই মহা প্রকৃতিশাস্ত্রের নিয়ম -অনুসন্ধান ও তদনুসারে চলতে চেষ্টা করাকে অনাবশ্যক জ্ঞান করা হয়, তবে এমন একটি সমাজযন্ত্র নির্মিত হয় যেখানে শাস্ত্রের চাবি দম দিচ্ছে এবং কলের পুঁতুল একান্ত বিশুদ্ধ নিয়মে চলে বেড়াচ্ছে।

এখনি তো দেখা যায়, কথায় কথায় রব উঠছে, হিঁদুয়ানি গেল! হিঁদুয়ানি গেল! কলিকাতার পথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক গৃহভিত্তি বড়ো বড়ো অক্ষরে ঘোষণা করছে, হিঁদুয়ানি যায়! হিঁদুয়ানি যায়! বাংলা দেশের গৃহে গৃহে সভায় সভায় বক্তারা কাষ্ঠমঞ্চের উপর চড়ে জগতের কানের কাছে প্রাণপণে চীৎকার করছেন, হিঁদুয়ানি থাকে না। হিঁদুয়ানি থাকে না! 'কী হয়েছে' 'কী হয়েছে' শব্দে সবাই ছুটে বেরিয়ে এল— উত্তর শুনতে পেলে বারো বৎসরের অপরিণত বালিকাকে যদি বালিকার ভাবে না দেখতে পারো তবে হিঁদুয়ানি আর থাকে না। প্রথাটা ভালো কি মন্দ, সাধু কি অসাধু, মনুষ্যোচিত কি পাশব, যুক্তি এবং স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি -দ্বারা তার কোনো মীমাংসাচেষ্টা অনাবশ্যক, কেবল কথাটা এই সে না থাকলে হিঁদুয়ানি থাকে না! তাই শুনে, হিন্দুধর্মের মহত্ত্বের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে তারা লজ্জায় নতশির হয়ে রইল। শুনে, হিন্দুধর্ম এবং হিঁদুয়ানি এই দুটো শব্দকে স্বতন্ত্র জাতিতে পৃথক করে রাখতে ইচ্ছা করে।

যাই হোক, আমরা আপনাকে বোঝাতে পারি যে, হিঁদুয়ানির সমস্তই ভালো, কারণ হিঁদুয়ানির সমস্তই ধর্মনিয়ম; যুক্তির দ্বারা যদি বা কারও বিশ্বাস জন্মে যে কোনো-একটা সমাজপ্রথা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক তথাপি সেটা পালন করা ধর্ম, কারণ আমাদের সমস্ত সমাজনিয়মই ধর্মানুগত অতএব যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত -দ্বারা ধর্মকে অধর্ম বলে দাঁড় করানো যেতে পারে না; আপনাকে এবং আপনার শিষ্যদের বোঝাতে পারি যে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য-নামক এক প্রকার অ্যানিমল্-ম্যাগ্নেটিস্‌ম্, অথবা আধ্যাত্মিক তেজ অথবা কী-একটা অনির্বচনীয় শক্তি রক্ষার পক্ষে জাতিভেদ একান্ত আবশ্যক— কিন্তু প্রকৃতিকে এরূপ বিপরীত ব্যাখ্যায় ভোলাতে পারব না। সে কোনো উত্তর দেবে না, কেবল মনে মনে বলবে— 'ভালো, তবে আধ্যাত্মিক তেজ রক্ষা করো এবং— মরো!'

কিন্তু এখন সমস্ত জাতিকে রক্ষা করতে হবে, কেবল টিকি এবং পৈতেটুকুকে নয়। আপনার সমগ্র মনুষ্যত্বকে মানবের সংস্রবে আনতে হবে, কেবল প্রাণহীন কঠিন ব্রহ্মণ্যের মধ্যে তাকে আগলে রেখে অজ্ঞতা এবং অন্ধ দাম্ভিকতার দ্বারা তাকে বনেদি বংশের অত্যন্ত আদুরে ছেলেটির মতো স্থূল এবং অকর্মণ্য করে তুললে আর অধিক দিন চলবে না।

কিন্তু সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয় সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দু'ই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে আহার কমিয়ে দিয়ে দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখানো হয় তা হলে এক দল

চলৎশক্তিরহিত অতি নিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়, জীবস্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়, দেখে বোধ হয় ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন— জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে-সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয়, এবং দুরন্ত ছেলে কখনো কাঁদে, কখনো ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট, অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তাকে যদি মৃতপ্রায় করে রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য করা যেতে পারে।

বালিকাকে যদি কিশোরী করে বিবাহ দেওয়া যায় তবে তার অনেক বিপদ, বালককে যদি যৌবনকাল পর্যন্ত অবিবাহিত রাখা যায় তবে তার অনেক আশঙ্কা, জ্ঞানশিক্ষার দ্বারা স্ত্রীলোকদের যদি চিত্তস্ফূর্তির উপায় করে দিতে হয় তবে তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিস্তর ভাবনা। তার চেয়ে বালক-বালিকার বিবাহ দিয়ে, স্ত্রীলোকদের অশিক্ষিত রেখে, অনেক সতর্কতা সংযম এবং পরিশ্রমের হাত এড়ানো যেতে পারে।

তা ছাড়া, স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখাবার আবশ্যক কী? লেখাপড়া না শিখে তারা কি এতকাল ঘরকন্নার কাজ চালায় নি? তাদের যে কাজ তাতে সম্পূর্ণ চিত্তবিকাশের কোনো প্রয়োজন করে না। রন্ধনকার্যে রসায়নবিদ্যা যে অত্যাবশ্যক তা বলা যায় না, এবং গর্ভধারণে তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি কোনো সহায়তা করে না।

বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোক হঠাৎ জানতে পায় বাসুকীর মাথার উপর পৃথিবী নেই, পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করছে, তা হলে কি আর স্ত্রীচরিত্রের কমনীয়তা রক্ষা হবে, এবং স্ত্রীলোক

যদি একবার সাহিত্য ইতিহাসের আস্বাদ পায় তা হলে সে কি আর আপনার গর্ভের ছেলেকে কিছুতে ভালোবাসতে পারবে ?

কিন্তু কাজ চালানো নিয়ে বিষয় নয়। মানুষকে কাজও চালাতে হবে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি হতে হবে। এমন-কি কাজ চালানো ছাড়িয়েও যত বেশি উঠতে পারি ততই বেশি মনুষ্যত্ব। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি চাষ করতে পারে সে চাষা, তার দ্বারা আমরা যতই উপকার পাই আমাদের সমকক্ষ মনুষ্য বলে আমরা তাকে সমাদর করতে পারি নে।

অতএব, স্ত্রীলোকেরা যে কেবল আমাদের বিশেষ কাজ করবেন এবং কেবলমাত্র তারই জন্যে উপযোগী হবেন তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট নয়: তাঁরা কেবল ভার্যা এবং গর্ভধারিণী নন, তাঁরা মানবী, অতএব সাধারণ বুদ্ধি এবং সাধারণ জ্ঞান তাঁদের উন্নতির পক্ষেও আবশ্যক। কেবল তাই নয়—বলতে সাহস হয় না, গড়ের মাঠ যদি সাধারণের জন্য হয় তবে এই গড়ের মাঠের হাওয়ায় তাঁদেরও শরীরের স্বাস্থ্য এবং চিত্তের প্রফুল্লতা ও কমনীয়তা সাধন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তাঁরা আমাদের স্ত্রী এবং জননী ব'লেই যে তাঁদের এই পৃথিবীর শোভা স্বাস্থ্য জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা অত্যাবশ্যক এ কথার কোনো অর্থ বোঝা যায় না।

এমন কথা কেন কেহ বলেন না যে, 'দয়ামায়া স্নেহপ্রেমের চর্চা পুরুষের পক্ষে যে কেবলমাত্র অনাবশ্যক তা নয় হানিজনক। কারণ, হৃদয়ের চর্চায় পুরুষেরা কঠিন কর্মক্ষেত্রের অনুপযোগী হয়ে পড়েন। পুরুষের এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যাতে করে কেবলমাত্র পুরুষের বিশেষত্বটুকুই প্রস্ফুটিত হয়।'

বরং বিপরীত কথাই বরাবর শুনে আসছি, সকলেই একবাক্যে বলেন কেবল বুদ্ধি বিদ্যা কর্মিষ্ঠতাতেই পুরুষের পূর্ণতাসাধন হয় না,

তার সঙ্গে সহৃদয়তা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও তাঁরা কেন সেইরূপ বলেন না যে, কেবলমাত্র স্নেহ প্রেম এবং গৃহকর্ম-পটুতাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়— তাঁর মনুষ্যত্বসাধনের জন্যে বুদ্ধিবিদ্যার চর্চাও নিতান্ত আবশ্যক।

যদি এমন কথা কেউ বলেন 'আমাদের সামর্থ্য নেই' অথবা 'আমাদের রমণীদের সময় নেই', সে স্বতন্ত্র। যদি কোনো ব্যবসায়ী লোক বলেন 'পড়াশুনা করা, সংগীতশিল্প আলোচনা করা, শরীর মনের স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা সাধন করার অবসর অথবা শক্তি আমার নেই, আমার সমস্ত সময় এবং সমস্ত অর্থ ব্যবসায়ে না লাগালে নিতান্তই চলে না', তবে আর কী বলব? বলব, দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ কথা বলব না— ব্যবসায়ীর পক্ষে শরীর মনের উন্নতিসাধনের চেষ্টা একেবারে অনুচিত।

বাড়ির চারি দিকে ফাঁকা স্থান না থাকলেও বাস করা চলে এবং স্ত্রীলোকদের শরীর মনের অপরিণতি সত্ত্বেও ঘরকর্নার কাজ চলে আসছে, কিন্তু তাই বলে বাগান করা যে অর্থের অসৎকার এবং স্ত্রীলোকদের মনুষ্যোচিত সুশিক্ষা দেওয়া যে সময় ও শক্তির অপব্যয় তা কৃপণস্বভাব লোকের কথা। এবং কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা কেবলমাত্র কল্পনাবলে সুশিক্ষিতা রমণীদের প্রতি হৃদয়হীনতা প্রভৃতি অমূলক অপবাদ আরোপ করে থাকেন তাঁরা যে কেবলমাত্র আপনাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তা নয়, তাঁরা আপনাদের স্বাভাবিক বর্বরতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

যাঁদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটুকু পুনশ্চ জানতে পেরেছেন যে, রমণী স্বভাবতঃই রমণী। এবং শিক্ষা এমন একটা অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা নয় যাতে করে নারীকে পুরুষ করে দিতে পারে। তাঁরা এইটে দেখেছেন, শিক্ষিতা

রমণীও রোগের সময় প্রিয়জনকে প্রাণপণে শুশ্রূষা করে থাকেন, শোকের সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধিপ্রভাবে তপ্তহৃদয়ে যথাকালে যথাবিহিত সান্ত্বনাসুধা বর্ষণ করেন, এবং অনাথ আতুর জনের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক করুণা সে তাঁদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করছে না।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি এতে অনেক কাজ এবং অনেক ভাবনা বেড়ে যায়, এবং সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতঃই বেড়ে উঠতে থাকে। যদি আমরা বলি আমরা এতটা পেরে উঠব না, আমাদের এত উদ্যম নেই, শক্তি নেই--- যদি আমাদের পিতামাতারা বলে 'পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন-কি অসম্ভব বললেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত আছি'--- যদি আমাদের ছাত্রবৃন্দ বলে 'সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীর মনের সম্পূর্ণতা-লাভের জন্যে প্রতীক্ষা করতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানিরও সেই বিধান--- আমরা চাই নে উন্নতি, চাই নে ঝঞ্ঝাট, আমাদের এই রকম ভাবেই বেশ চলে যাবে'— তবে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বলতেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা ব'লে অনুভব করাও ভালো, কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করলে সদ্গতির পথ একেবারে আটে-ঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা -দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধানে থেকে কালের সীমান্তদেশে আমরা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই, এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি— কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি, আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল— আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন, তাকে একেবারে কর্মাতীত অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা— সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়বসাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপ্‌তেজের সংস্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি

সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত-অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার-মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রু-রক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন! তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানব-সমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত-দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শাল-প্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধী নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি আমরা সেই সভ্য জাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ক'রে, ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত ক'রে, হিউমকে ম্লেচ্ছ ব'লে, কন্‌গ্রেসকে একঘরে ক'রে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় ক'রে উন্নতমস্তকে দাঁড় করাতে পারি—যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে, চতুর্দিক থেকে জ্ঞান

এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি— যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা ক'রে, দেশে বিদেশে ভ্রমণ ক'রে, পৃথিবীতে সমস্ত তন্নতন্ন নিরীক্ষণ ক'রে এবং মনোযোগ-সহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা ক'রে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি— তা হলে আমরা যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিঁকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে জীবন্ত সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্যসাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্ছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি আদান-প্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্তবর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্প-পল্লবের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই ব'লে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিত ভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তম্ভ নির্মাণ করছি। কারণ, নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা-দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড সংগ্রহ করে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করছি তাও নয়। ইংরাজের রানীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনছি। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু করছি কী? আগুন নেই, কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে, নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ দিকের কেন্দ্রস্থলে ; সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন ক'রে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে ; এক দিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, প্রবন্ধটা ক্রমে অনেকটা উপদেশের মতো শুনতে হয়ে আসছে — এজন্যে আমি সর্বসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কবি। এ রকম দুরভিসন্ধি আমার গোড়ায় ছিল না— তৎপক্ষে আমাব কতকগুলি গুরুতর বাধাও আছে।

অল্পদিন হল আমার কোনো লেখা যদি আমার দুরদৃষ্টক্রমে কারও অবিকল মনের মতো না হত তিনি বলতেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরে নি। আমার এই তরুণ বয়সের কথা আমাকে এতকাল ধরে এতবার শুনতে হয়েছে যে শুনতে শুনতে আমার মনে এই একটা সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বন্ধে প্রতিবৎসর নিয়মিত ডবল প্রোমোশন পেয়ে থাকে, কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতা-বশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পারলুম না।

এই তো গেল পূর্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাব-বশতঃ আমার কোনো রচনায় আমি এমন একটা বিষম অপরাধ করে বসি যাতে করে কারও সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত

পালিত, দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই। আমার সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলো কিম্বদন্তি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এই-জন্য উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে অসংকোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার মনে উদয় হয় না।

বিশেষতঃ এই প্রবন্ধে এত রকম রচনার ত্রুটি আছে যে, সে-সমস্ত জেনেশুনে উপদেশ দিতে কিম্বা কোনো-একটা মত ওরই মধ্যে একটু উচ্চস্বরে বলতে আমার সাহস হয় না। প্রথমতঃ আমার ভাষা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত আছি। আমি প্রচলিত ভাষা এবং পুঁথির ভাষার মধ্যে পংক্তিভেদ রক্ষা করি নি।

দ্বিতীয়তঃ ভাবেরও আনুপূর্বিক সংগতি নেই। বিশ্বরচনা থেকে আরম্ভ করে দরখাস্ত-রচনা পর্যন্ত সকল রচনাতেই হয় সাধারণ থেকে বিশেষের পরিণতি নয় বিশেষ থেকে সাধারণের উদ্ভব; হয় সূক্ষ্ম হতে স্থূল নয় স্থূল হতে সূক্ষ্ম, হয় বাষ্প থেকে জল নয় জল থেকে বাষ্পোদ্গম হয়ে থাকে। আমি যে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিসের থেকে কী করেছি ভালো স্মরণ হচ্ছে না। যদি কোনো তর্ককুশল ব্যক্তি কাজটা তাঁর অযোগ্য না মনে করেন তবে অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, এই রচনায় পদে পদে আমার এক পদ আর-এক পদকে প্রতিবাদ করে চলেছে; আমার এক পদ যখন গতি আশ্রয় করে অগ্রসর আমার আর-এক পদ তখন স্থিতি আশ্রয় করে পশ্চাৎবর্তী; আমার দক্ষিণপদ যখন পূর্বের দিকে আমার বামপদ তখন পশ্চিমের দিকে এবং চলেছি হয়তো উত্তরের দিকে। এ কথা বললেই আমাকে তৎক্ষণাৎ থামতে হবে, কারণ, এর উর্ধ্বে আর উত্তর নেই।

তৃতীয়তঃ শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করবেন আমার এ লেখা

প্র্যাক্‌টিকাল হয় নি; সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা ছাড়া সাধারণে একে আর-কোনো ব্যবহারে আনতে পারবেন না। কিন্তু সেটা আমাদের বংশাবলীর ধারা। ভগবান শাণ্ডিল্য এবং তাঁর সমসাময়িক পিতামহগণ কেউ প্র্যাক্‌টিকাল ছিলেন না। তাঁরা হোমানলে যে পরিমাণে অজস্র ঘৃত ব্যয় করেছেন সে খরচটা কি বর্তমান সভ্যতার কোনো হিসাবী লোক প্র্যাক্‌টিকাল শিরে লিখতে পারেন?

অবশ্য, তাঁদের সময়েও প্র্যাক্‌টিকাল এবং অপ্র্যাক্‌টিকালের একটা সীমা নির্দিষ্ট ছিল। ভস্মে ঘৃত ঢালাটা তাঁদের কালের বিষয়বুদ্ধিতেও নিতান্ত অপব্যয় বলে বোধ হত। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে সহসা যে-একটি অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন দীপ্তিমান পরমরমণীয় শিখার উদ্ভব হয় সেটাকে তখনকার কালের প্র্যাক্‌টিকাল লোকেরা একটা ফললাভস্বরূপ গণ্য করতেন।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞসমাজে যে-কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার হোক-না কেন, তৎক্ষণাৎ পাঁচজনে প'ড়ে তার উপরে সহস্র পেয়াদা লাগিয়ে, সেটাকে ধ'রে বেঁধে, নির্যাতন ক'রে, কখনো বা তার ঘর ভেঙে দিয়ে, কখনো বা তাকে কারারুদ্ধ ক'রে, তার যথাসর্বস্ব আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়েন; তার বসনাঞ্চল ঝাড়া দিয়ে ভূরিভূরি প্র্যাক্‌টিক্যাল ফল বাহির করেন। তাঁরা মন্ত্র পড়ে এই বিশ্বের মধ্যে থেকে যে ষাট-সত্তরটি ভূত নামিয়েছেন তাদের দিয়ে অহর্নিশি ভূতের বেগার খাটিয়ে নেন!

আমাদের পূর্বপুরুষগণও সৃষ্টির অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করে গেছেন। কিন্তু সত্ত্ব রজ তম নিয়ে কারও ধুয়ে খাবার যো নেই; যে পাঁচটি ভূতের সন্ধান পেয়েছেন তাদের দ্বারা সময়ে অসময়ে কোনো-যে একটা বিশেষ ফল পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা

দেখি নে। অতএব যাঁরা কৌলিক স্বভাবের নিয়ম মানেন তাঁরা আমার এই প্র্যাক্‌টিকাল ভাবের অভাব দেখে দুঃখিত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্মিত হবেন না।

তার পরে আবার আমরা বাঙালিরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে 'স্বাধীন'চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই— যে চিন্তার কোনো অবলম্বন নেই; যার জন্যে কোনো বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের কোনো আবশ্যক করে না। আর সকল প্রকার অপবাদই আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু চিন্তা সম্বন্ধে কারও সাহায্য গ্রহণ করেছি এ অপবাদ অসহ্য। স্ত্রীলোকদের ন্যায় আমাদের অশিক্ষিতপটুত্ব। প্রচলিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সঙ্গে যতই অনৈক্য হবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ততই স্বাধীনচিন্তাসম্পন্ন বলে সমাদৃত হবে; এবং যতই আমরা অধিক চক্ষু মুদ্রিত করতে পারব, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ততই আমাদের সমধিক পারদর্শিতা লাভ হবে।

আমিও এই রকম স্বাধীন চিন্তা ভালোবাসি বলে আমার লেখা প্র্যাক্‌টিকাল হয় না। আমাদের চিন্তাশীলগণ কোন্-এক অপূর্ব তপস্যাবলে স্বর্গ মর্ত উভয়েরই অতীত এক স্বতন্ত্র স্বাধীন লোক লাভ করেছেন; সেই আশমানপুরীর সব চেয়ে সৃষ্টিছাড়া একটা কোণ আশ্রয় করে আমি পড়ে থাকি। তবু এখানকার অনেকেই স্বমনঃকল্পিত দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি ক'রে এবং স্বগৃহরচিত পলিটিক্‌স্ চর্চা ক'রে এই নিরাধার চিন্তাজগতের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে এখানকার লোকেরাও আমার নামে অভিযোগ করে থাকেন যে, আমার দ্বারা কোনো প্র্যাক্‌টিকাল কাজ হচ্ছে না, কেবল আমি রাশি রাশি বাষ্প রচনা করে দেশের বীর্য বল বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছি।

আমি চিহ্নিত অপরাধী। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে থাকি। অস্মদ্দেশের সকলেই স্বাধীন চিন্তা করে থাকেন, আমিও তাই করি; কিন্তু আমি যে-সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাতে চিন্তার স্বাধীনতার কোনো গৌরব নেই। এই, জগতের গাছটা-পালাটার কম্পন কিম্বা মর্মর, কিম্বা মলয়বাতাসের হিল্লোল, কিম্বা বড়ো বাড়াবাড়ি হল তো কৃষ্ণনয়ন এবং মিষ্ট হাস্য —এই নিয়ে নিজের মনে ব'সে জাল বোনা এবং নিজের জালে নিজে জড়িয়ে থাকা এটা বড়ো বেশি কথা হল না। কিন্তু মানবতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব ইতিহাস এবং পলিটিক্‌স্ যদি সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে গড়ে তুলতে পারা যায়, তা হলেই একটা দুরূহ কাজ করা হয় বটে এবং আমরা যে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গরাজ্যে থাকি সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ উপকার করা হয়।

যাই হোক, আমি ভারতবর্ষ কিম্বা য়ুরোপ সম্বন্ধে কোনো নূতন কথা, দুরূহ কথা কিম্বা কাজের কথা বলতে অক্ষম। আমার মনে স্বতঃ যখন যে ভাবের উদয় হয় তাই মনের মতো করে প্রকাশ করতে সুখ হয় এবং তাই সকলকে শোনাতে ইচ্ছা করে। উপকার করবার জন্যে নয়, আনন্দ করবার জন্যে।

এ লেখাটার সেই রকম ভাবেই উৎপত্তি। কখনো সমুদ্রপথে কখনো বা য়ুরোপের মহাদেশে যখন যে কথাটা মনে উদয় হয়েছে তখন সেইটেই ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছি। বেশি চিন্তা কিম্বা বহুল অন্বেষণ কিম্বা কোনো বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত মনে মনে অনুসরণ করবার চেষ্টা করি নি। সমালোচনার ভাষায় যাকে 'গবেষণা' বলা হয় আমার এ লেখায় তার চিহ্নমাত্র নেই। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য, কখনো হৃদয় এক দিকে টেনেছে কখনো অভিজ্ঞতা আর-এক দিকে পথ দেখিয়েছে। হয়তো একটি কিম্বা দুটি মাত্র

ঘটনা থেকে একটা বিশ্বাস অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে স্থানলাভ করেছে, কোনো রকম বহুল প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নি। এই জন্যে আমার এ-সমস্ত কথাই কাঁচা, গাছের পল্লবের মতো কাঁচা, অল্প আঘাতেই ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু গাছের পক্ষে সে অত্যাবশ্যক এবং দর্শকের পক্ষেও হয়তো তার এক প্রকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য থাকতে পারে।

বাসস্থানের ব্যবস্থা অনেক রকমের হতে পারে। এক, বসে বসে গভীর ভিত্তি খনন ক'রে, মেপেজুখে, একটি ইঁটের পরে আর-একটি ইঁট বসিয়ে দৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করা; কিন্তু তা সময় ও ব্যয় -সাপেক্ষ এবং সেটা কাঁধে করে টেনে নিয়ে বেড়াবার যো নেই। আর এক রকম আছে, তাঁবুর বন্দোবস্ত; তার অনেক উপস্থিত সুবিধা আছে।

ভ্রমণকালে আমি এই রকমের একটা তাঁবু আশ্রয় করে ঘুরেছিলুম। বসে বসে অসীম ধৈর্য সহকারে কোথাও মতের পাকা ইমারত বানাবার চেষ্টা করি নি। যথেষ্ট সময়ও ছিল না এবং আমার মানসিক স্বভাবটাও ঐ রকম ভিটেছাড়া।

যখন চেয়ে দেখি সংসারপথের দুই ধারে বড়ো বড়ো লক্ষ্মীমন্ত লোক বেড়াটি ফেঁদে, দালানটি তুলে, গোলাঘরটি পরিপূর্ণ ক'রে, তুলসীতলাটি বাঁধিয়ে, উঠোনটি তক্‌তকে ক'রে বংশপরম্পরায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট সন্তুষ্ট হয়ে বাস করছে— অবশিষ্ট পৃথিবী অবশিষ্ট লোকের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠাস্থানটুকুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়-বন্ধন করেছে— তখন আমার লোভ হয়; গুটিকতক অত্যন্ত পাকা বিশ্বাসের মধ্যে মানসিক গার্হস্থ্য স্থাপন করে একটি জায়গায় স্থায়িত্ব লাভ করবার জন্যে ক্ষণেককাল মন ব্যাকুল হয়; কিন্তু পরক্ষণেই

অদৃষ্টের অলক্ষ্মী নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে আবার পথ থেকে পথে, দ্বার থেকে দ্বারে, দেশ থেকে দেশান্তরে টেনে নিয়ে যায়।

যখন দেখলুম আমার দশাই এই রকম, তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম— তা, এক রকম ভালোই হয়েছে। কারণ, যদি অধিকার স্থাপন করতে চাও তা হলে অল্প পরিমাণের জন্যে বিশ্বসংসারের অধিকাংশই আপোষে ছেড়ে দিতে হয়। আর যদি কেবল দেখতে শুনতে, উপভোগ করতে চাও, তা হলে কিছুরই উপরে দাবি না ছেড়ে সর্বত্রই গতিবিধির পথ মুক্ত রাখা যায়।

সেই কারণে আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কিছুই অধিকারের চেষ্টা করি নি। পথের উপর দিয়ে নয়ন মেলে চলে এলুম এবং মনে আপনি যা উদয় হল তাই সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম— এ কেবল সাহিত্যের ছিটেবেনানি, এতে হাল লাঙল চাষ নিড়েনের কোনো সম্পর্ক নেই।

এরা কী করে এত সস্তায় দেশালাই তৈরি করে তা আমি দেখি নি; তা ছাড়া ইস্পাতের ছুরি, কাঁচের বাসন এবং কাপড়ের কল সম্বন্ধেও আমি কোনোরূপ সন্ধান করতে পারি নি।

আমি কেবল দেখলুম জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লেমেণ্ট্ চলছে— সকলই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে— হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে! আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চনদারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক

আমোদের উদ্দেশেও, মানুষের শক্তি আপন পেশী এবং স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে।

জাহাজে বসে ভাবতুম এই-যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ বা বিশ্রাম-সুখে কেউ বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত, কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে—সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা! কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম! মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলছে! কিন্তু, কী করা যাবে! আমাদের মানবরাজা চলেছেন; কোথাও তিনি থামতে চান না; অনর্থক কাল নষ্ট কিম্বা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে যেমন ঐশ্বর্যে থাকেন পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত; ভোজনশালা সংগীতমণ্ডপ সুসজ্জিত, স্বর্ণচিত্রিত, শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত, শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশ দিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সম্বৎসর-কাল চেষ্টা চলছে।

এ রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood -রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

খুব সম্ভব দুর্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরমসুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয় এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানব-জীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্যও অপূর্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারও চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতির আইন -অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায় তা হলে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ক্রমশঃ ধ্বংস করে ফেলে।

স্মরণ হচ্ছে, য়ুরোপের কোনো-এক বড়োলোক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেছেন যে, এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য কী! কারণ, আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে রয়েছে, কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে বিপদ সেইখানে বসে গোপনে

বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবি যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশানকোণ থেকেই ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আর-একটা কথা মনে হয়— যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু বাহির হতে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি ; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে চলতে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার -গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশঃ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কুমারী পাত্রের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকাসংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান-অধিকার-প্রাপ্তির যে চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়ে-দেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেন -রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায় নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা

সমাজপ্রথার অনুকূলে। এই রকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাই-হিলিস্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে আপাততঃ আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়-মূর্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বলো আর অবলা রমণীই বলো, দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই ; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এই জন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে, 'আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয় আমাদের বলও আছে।' অতএব 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে!' হায়, আমরা ইংরাজশাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বলছি 'নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে'।

এই তো অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলন্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয় তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্ছে ব'লে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরাজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কথাটি কবার যো নেই। ইংরাজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়েঝুড়ে, নিংড়ে,

ভাঁজ ক'রে, পাট ক'রে, ইস্ত্রি ক'রে, নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। আমরা ইংরাজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি ; যদি কোনো-কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার— নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্ন ভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাই নে। অতএব যখন এই দুর্লভ করুণার অস্থানে অপব্যয় দেখি তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দুগাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো বা ভালোবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে— কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে— বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলন্ডেও তার অভাব নেই। যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতর আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন ?

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে থাকেন। মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানব-হিতৈষী হয়ে উঠে, তা হলে সমস্ত মানবজাতিকে একটা শৈবাল-বহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে কিছুতে কি তার করুণ

হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়? তোমরা বাহিরে সুখী আমরা গৃহে সুখী, এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কী করে?

একজন লেডি-ডফারিন স্ত্রীডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে অপরিচ্ছন্ন ছোটো কুঠরি, ছোটো ছোটো জালনা, বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্‌স্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন— তখন সে মনে করে কী সর্বনাশ, কী ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কী স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে! জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রি যাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই বললেই হয়, কিন্তু তবুও তো আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোশের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় এক হাতে তাকিয়া আঁকড়ে ধরে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও তো অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই; ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজাফি অধ্যয়ন করে থাকি, তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে, আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মতো বিশ্বাসবিহীন হয়ে আসছে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। কৌচ-কেদারা খেলাধুলা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রী পুত্র না হলেও

তোমাদের বেশ চলে যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে ভালোবাসা। আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের জোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব, আমরা যখন বলি 'আমরা যে বিবাহ করে থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ রেখে পারত্রিক মুক্তি-সাধনের জন্য', কথাটা খুব জাঁকালো শুনতে হয়, কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্ছে, ও না হলে আমাদের চলে না— আমরা থাকতে পারি নে। আমরা শুশুকের মতো কর্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্‌বাজি খেলে বেড়াই বটে, কিন্তু চট্‌ করে অমনি যখন-তখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস্‌ করে হাঁফ ছেড়ে না এলে আমরা বাঁচি নে। যিনি যাই বলুন সেটা পারলৌকিক সদ্গতির জন্যে নয়।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সে কথা এখানে বিচার্য নয়; সে কথা নিয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন তাতে সমাজের ভালোমন্দ যাই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ এক রকম সুখে আছে। ইংরাজেরা মনে করতে পারেন লন টেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

উপেক্ষা এবং উপহাস-যোগ্য জ্ঞান করি। এমন-কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাসরসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন। কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায় আমাদের স্ত্রী কন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না, এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত? আমরা কি এক রকম কাঁচা-পাকা জোড়াতাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই? আমাদের কি পর্যবেক্ষণশক্তি বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে? আমরা কি সর্বদাই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে ফেলি নে এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করে সর্বদাই অটল এবং দাম্ভিক ভাবে বসে থাকে না? আমাদের এই রকম দুর্বল শিক্ষা এবং দুর্বল চরিত্রের জন্য সর্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসংগতি দেখা যায় না? আমাদের বাঙালিদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি এক প্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না?

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখি নি, ভাবতে শিখি নি, কাজ করতে শিখি নি, সেই জন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই। আমরা যা বলি, যা করি, সমস্ত খেলার মতো মনে হয়; সমস্ত অকালমুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেইজন্যে আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের এসের মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্য, জীবনের ব্যবহারের জন্য নয়— আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা তো আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই বা

শিক্ষা হবে! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে অন্তরের স্থান অধিকার করে থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশ-লাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা হলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরাজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণস্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনি অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে, নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারও কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেকগুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব করে রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মতো হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো-এক জনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে এ দেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে, কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি—পরিবারকেই আমরা সংসার বলে থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর-এক কাণ্ড দেখা যাচ্ছে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল ব'লে তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিম্বা মানব-হিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম

সমাজে একবার যদি এই বাহ্য সজ্জাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সে এমনি প্রভু হয়ে বসে যে তার হাত থেকে সহজে এড়াবার যো থাকে না; তখন সে ক্রমে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এদেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেউ পসার করতে ইচ্ছে করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই যুড়ি ঘোড়া এবং বড় বাড়ির আবশ্যক, এই জন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বেই নিজেই মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর পরে পাল্কী অবলম্বনপূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না — কিন্তু একবার যদি ঘড়ি ঘড়ির আমদানি দেওয়া হয়, তবে সমস্ত চরক সুশ্রুত ধন্বন্তরির সাধ্য নেই তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। মানুষের সঙ্গে সজ্জার চক্ষুরিন্দ্রিয়সূত্রে একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে ওঠে। এই জন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে প্রথমে দেখা দেয়, অবশেষে বহিরাড়ম্বরের অনুগত অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

হয়েছেন তেমনি আর-এক দিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্ছেন। এক দিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর-এক দিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরাজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্ধাঙ্গ। আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরাজ বলেন আসবাব-অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদ্‌কে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনি প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার যো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এ দেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই যুড়িগাড়ি এবং বড়ো বাড়ির আবশ্যক; এই জন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ-মহাশয় যদি চটি এবং চাদর পরে পাল্কি-অবলম্বন-পূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়ির-চেন'কে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক সুশ্রুত ধন্বন্তরির সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে উঠে। এইজন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে মন্দিরে প্রবেশ করে, তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্যনিদর্শন-

স্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয়, অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে এক-একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন-সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ করে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে। গৃহ, যা মানুষের স্নেহ প্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চির-উৎসভূমি, পৃথিবীর আর-সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে; হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।

নতুবা যে সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্-নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়? সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে প'ড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে? যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনি

সন্ধ্যাবেলায় ঐ শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক, আমার মতো অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম-অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের তথ্য নেওয়ার মতো হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে-কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি-না কেন, তার সত্য-মিথ্যা-পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ-সকল কথা যিনি যে ভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কথাটা বলছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে আমার বোধ হয় না।

যে দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল-বৃদ্ধি হচ্ছে— যে-যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easy-chairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরটের পাইপটি এবং জুয়া খেলবার ক্লাবটি নিয়ে নির্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে— সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙে গেছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী-মক্ষিকারা কর্তৃত্ব করতেন ; এখন স্বার্থপরগণ যে-যার নিজের নিজের চাক ভাড়া করে সকালে মধু-উপার্জন-পূর্বক সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানী-মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবল মাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্তমান অবস্থা এখনো তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে যায় নি, এই জন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁরা ইতস্ততঃ ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মহারানীদের রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের

মর্মস্থানটি অধিকার ক'রে সকল-ক'টিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

// কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতঃই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমশঃ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা-পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবল মাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিতসমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমি স্থানান্তরে অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি, আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। এক জনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ, আর-একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবতঃ অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডা-ওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এই জন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারও বক্তৃতায় নয়, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরাজি শিক্ষা প্রবেশ করে সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সম্বরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব—

আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই-না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে, কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পেতে পারি, কিন্তু ইংলন্‌ড্‌ পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায়, কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইব্‌ল্‌ যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দান্ত ভাব রক্ষা করে এসেছে; বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি। //

আমার তো বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, য়ুরোপ বাল্যকাল হতে এমন একটি শিক্ষা পাচ্ছে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্ছে এবং সর্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে রাখছে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তা হলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তা হলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাকত না, তা হলে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃস্টধর্ম সর্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত, মন এবং আত্মার মধ্যে, সামঞ্জস্য সাধন করে রেখেছে।

খৃষ্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করছে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইব্‌ল্‌-সহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের

হৃদয়ে স্থান লাভ ক'রে সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য বিকাশ করেছে। উপদেশের দ্বারায় নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে?

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এই জন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নবজীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনো প্রকৃত ভালো কখনোই পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, তারা অনুযোগী। অবস্থা-বশতঃ আমরা কেহ একটাকে কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে দেওয়া যায় না। এমন-কি, সকল ভালোর মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে, এক জনকে দূর করলেই আর-এক জন দুর্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ আপনার গতি বন্ধ করে সংসারপথপার্শ্বে এক স্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিম্বা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তা হলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান, অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই

আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়ের। একটা সভা করে এই সততচঞ্চল পরিবর্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহার-পূর্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব। কিম্বা সে এমন তর্কও করতে পারে যে, ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল হেয় এবং নিম্নবর্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতকপক্ষীর মতো কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব।—

দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনি বর্তমান কালে যাঁরা বলেন 'আমরা আর্যশাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে থাকব', কিম্বা যাঁরা বলেন 'হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতসবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব', তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজবুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতেই হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো-একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলই যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়! তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই-যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।

অতএব, ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কী হবে? আমরা ইংরাজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব, উন্নত হব, জীবন্ত হব। মোটের

উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব ; তবে, এখন যেমন ‘ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ’ তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিম্বা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় বলে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব-পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিম্বা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎ-শিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানতঃ সৈনিক বণিক অথবা পথিক -জাতি না হতেও পারি, কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থসামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান-প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের কিছু সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ ‘আইডিয়াল’টা যথেষ্ট উচ্চ না মনে হতেও পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন-কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মনুমেণ্ট্ কিম্বা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোক -গম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে তোলা যায় তাকে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎগগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং

বাহিরের সম্যক্ স্ফূর্তিসাধন ক'রে আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দর ভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন-মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ ক'রে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশ গণ্ডা দুই পাইকে একঘরে ক'রে কল্পনা করি— পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটা বিশেষ মহত্ত্ব লাভ করেছি, আমরা আধ্যাত্মিক— পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে, এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে। আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে। সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও না কোথাও আছে— তা নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক। অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা!

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে 'আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই— এমন-কি চাকরি-পিপাসুদের মতো কালেজে পাশ দেওয়া আমার ধনমর্যাদার হানিজনক', তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর কিছু না করলেও চলে, এমন-কি কিছু না করাই কর্তব্য।

এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই, কেবল

এই কীটদষ্ট চেক-বইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাতপূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি করে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাততঃ আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে ইংরাজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা-দ্বারা আমাদের ভারত-বর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর ক'রে আমরা যদি পূরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি প'রে চতুর্দিকে লড়াই ক'রে ক'রে বেড়াই কিম্বা আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই, সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি। এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান, তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে : কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য-আশ্রয়টি উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশাভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু এ-সকল কেবল আমার মনের কথা মাত্র। নতুবা আমি যে য়ুরোপ এবং এসিয়ার মধ্যবর্তী ককাশস পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে চ'ড়ে এই খানকতক কাগজের ভেঁপু পাকিয়ে তার মধ্যে ফুৎকার প্রয়োগ করছি, যা শুনে যুবক য়ুরোপ সহসা তার কাজকর্ম বন্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে ঊর্ধ্বকর্ণে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এই গুরুতর দেহভারক্লান্ত

প্রাচীনা এসিয়ার অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মুহুর্মুহু হৃৎস্পন্দন হতে থাকবে, এমন উপহাস অনুগ্রহপূর্বক কেউ আমার প্রতি প্রয়োগ করবেন না।

কেবল এইটুকুমাত্র দুরাশাকে কোনোমতে মনে স্থান দিয়েছি যে, এই প্রবন্ধে আমার শ্রোতৃবর্গের ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবিনোদন হতেও পারে এবং সম্ভবতঃ তাঁদের মনে মধ্যে মধ্যে গুটিকয়েক তর্কের উদয় হবে— যদিও রুচিভেদে সে তর্কের তাঁরা যেমনি মীমাংসা করুন তাতে তাঁদের জীবনযাত্রার লেশমাত্র ভিন্নতা সাধন করবে না। সুধীগণ আমার রচনার বহুল পরিমাণ নীর পরিত্যাগ ক'রে, যৎসামান্য ক্ষীরটুকুমাত্র পথের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক-পূর্বক নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত হবেন। এই পরমসুসম্পন্ন চরমশ্রেষ্ঠ বঙ্গসমাজের কিছুমাত্র ইতস্ততঃ হয় এমন দুর্ঘটনা কিছুতেই না ঘটুক— কেবল যদি শ্রোতৃমহোদয়গণের মনে ক্ষণেকের জন্যে এই চিন্তার আভাসমাত্র উদয় হয়ে থাকে যে 'আমরা যত বড়োই হই হয়তো পৃথিবী আমাদের চেয়ে বড়ো, এবং আমাদের সেকাল যত বড়ো কালই হোক-না কেন এই অনন্তপ্রবাহিত কালের একটি অংশ মাত্র অধিকার করে ছিল', যদি মনে সংশয়মাত্র উত্থিত হয় যে 'কী জানি এই বৃহৎ পৃথিবীতে দৈবক্রমে যদি কোথাও কেহ আমাদের সমকক্ষ থাকে এবং এই অসীমকালে স্বভাবতই এমন পরিবর্তনপরম্পরা ঘটতেও পারে যা আমাদের সনাতন প্রথার আয়ত্তের অতীত', যদি ভবভূতির সেই মহদ্‌বাক্য কারও স্মরণ হয় যা তিনি অহংকারচ্ছলে উচ্চারণ করে ছিলেন কিন্তু যা শুনে মনে বৃহৎ আশার সঞ্চার হয় এবং ক্ষুদ্র অহংকার আতঙ্কে পলায়ন করে, তবেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করব—

কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী।

শুক্রবার। ২২ আগস্ট। ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে-একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্বে, সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হত ; লোকে বলত এক প্রহরের রাস্তা, দু দিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে যাচ্ছে।

কেবল তাই নয়-- আসিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মতো জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র-চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এমনি করে সভ্যতা সর্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।

এই রকম নানা উপদ্রবে সময়কে দেশছাড়া করে ফল হয়েছে এই যে, দেশের দেশত্ব আর ভালো করে উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, দেশের বৃহত্ত্বকে যদি কালের বৃহত্ত্ব দিয়ে না বুঝি তবে তাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করবার আর কোনো উপায় নেই। সে কেবল অঙ্কের মধ্যেই বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ তহবিলের মধ্যে না থেকে সে কেবল হিসাবের খাতার মধ্যেই থেকে যায়।

য়ুরোপ এবং আসিয়ার মধ্যে যে-একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে সেটা বোঝা এখনকার য়ুরোপযাত্রীর পক্ষে অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করে য়ুরোপে পৌঁছতে অর্ধেক বৎসর লাগত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা করবার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আসছে।

য়ুরোপ, য়ুরোপীয় সভ্যতা, শোনবামাত্র অস্তাচলের পরপারবর্তী এক নূতনজ্যোতিরালোকিত অপূর্ব দূরজগতের ভাব সহজেই কল্পনায় উদয় হওয়া উচিত। সেখানে যাত্রা আরম্ভ করবার পূর্বে মনে যথেষ্ট ভয় এবং যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বালকটি বালিকা নববধূর গহনা বিক্রয় এবং বৃদ্ধ পিতার বহুদুঃখ-সঞ্চিত অর্থ অপহরণ ক'রে সেখানে অনায়াসে নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে শ্মশ্রূদ্গমের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোপনে পলায়ন করে এবং শ্মশ্রূদ্গমের কিঞ্চিৎ পরেই বেশ বদল ক'রে, ঘাড়ের চুল ছেঁটে, দুই রিক্ত পকেটে দুই হাত গুঁজে দিয়ে, বাপের কোম্পানির কাগজ এবং চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে অত্যন্ত চটুল চঞ্চল ভাবে দেশে ফিরে আসে। এই কলে-ছাঁটা ছোকরাটি যে উনবিংশ শতাব্দীর তীর্থস্থানে গিয়ে মহাসমুদ্রের ঢেউ খেয়ে এসেছে এমনটা কিছুতেই মনে হয় না। মনে হয়, কোন্-এক শখের নাট্যশালায় কিছুকাল অভিনয় করে এল ; সেখানকার বাঁকা স্বর এখনো মুখে লেগে আছে, এবং সেখানকার অধিকারী-মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সাজের বেশখানি একে দান করেছেন ; আর কোনোরকম পারিতোষিক দিয়েছেন কি না বলতে পারি নে।

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হোক, চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের রিটারন্ টিকিট মাত্র নিয়ে য়ুরোপে চলেছি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের জন্যে চলেছি।

এমনতর ঘটনা শোনা যায় যে, ক্ষতচিকিৎসায় একজন লোকের একটা পায়ের আধখানা কেটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আজন্মকালের অভ্যাসবশতঃ সেই বিচ্ছিন্ন অংশের অস্তিত্ব কিছুতেই তার মন থেকে দূর হয় না। তেমনি ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের মাঝখানে স্বভাবতঃ যে-

একটা দীর্ঘকালের ব্যবধান আছে সেটা যদিও অর্ধেকের বেশি কেটে ফেলা হয়েছে, তবু আমার মন থেকে সেই অবশিষ্ট অংশ তাড়াতে পারছি নে। বহু দূর, বহু প্রভেদ, এবং বহু কাল, এই তিনটে ভাব এক সঙ্গে উদয় হয়ে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। সাত সমুদ্র তেরো নদী -পারবর্তী এই তিন মাসের স্বদেশবিরহকে অত্যন্ত দীর্ঘ বিরহ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু অনেকে আশঙ্কা করেন, বিরহ-নামক ব্যাপারটা সভ্যতার উপদ্রবে ভবলীলা সম্বরণ করে একান্ত কল্পনালোক প্রাপ্ত হয়েছে। কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি ইস্টিমার পোস্ট্-আপিস ছিল না তখনি খাঁটি বিরহ ছিল, এবং তখনকার দিনে বছর-খানেকের জন্য রামগিরিতে বদলি হয়ে যক্ষ যে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁঠে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সময়ই তেমনি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে। ছয় মাসকে যাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্ছে, পূর্বে যা মুটের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এই সংহতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখদুঃখ অল্প পরিসরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রতা প্রাপ্ত হচ্ছে। এখন ছয় মাসের বিরহ তিন মাসের মধ্যে ঘনভাবে বিরাজ করে, তাই মেঘদূতের মতো অত বড়ো বিরহ-কাব্য লেখবার আর সময় পাওয়া যায় না। এখন দুই-এক পাতার মধ্যেই গীতিকাব্যের সমাপ্তি হয়; এবং বিদ্যুৎযান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঢ় হবে যে, চতুর্দশপদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

আমার অবস্থা সেই রকম। সামান্য এই কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলেছি, কিন্তু ভারতবর্ষ একান্ত করুণস্বরে আমাকে আহ্বান করছে।

বলছে— বৎস, কোথায় যাস! কোন্ দূর সমুদ্রের তীরে? কোন্ যক্ষগন্ধর্বদের স্বর্ণপুরীতে? সেখানে আমার আহ্বানস্বর কি আর শুনতে পাবি?— আর যাই করিস, অবজ্ঞার ভাবে চলে যাস নে আর অবজ্ঞার ভাবে ফিরে আসিস নে। আমার দরিদ্রের ঘর, আমার কিছুই নেই, তোরা যা চাস তা সময়ে পাস নে— কিন্তু আমার ঘরে কেউ কি তোদের ভালোবাসে নি? শৈশবে কোনো নতনেত্র তোদের মুখের উপরে জাগ্রত স্নেহালোক বর্ষণ করে নি? রোগের সময় কোনো কোমল করতল তোদের তপ্ত ললাটে স্পর্শসুধা বিতরণ করে নি? ওরে অসন্তুষ্ট চঞ্চলহৃদয়, আমাকে ছেড়ে যাবার সময় কি কেবল দারিদ্র্যদুঃখই ছেড়ে গেলি, জগতের দুর্লভধন ভালোবাসা ছেড়ে গেলি নে? সেই অলকাপুরীতে কোনো দুঃস্বপ্নে যখন আমাকে মনে পড়বে তখন কি আমার স্নেহের কোল মনে পড়বে না, কেবল তার জীর্ণ চীরখানাই মনে পড়বে?

তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘ রেখা এখনো দেখা যাচ্ছে; দেখে মনে হল আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুল বাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন; বলছেন, আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস নে! এখনো ফিরে আয়!

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্তশয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট্‌হাউসের আলো জ্বলে উঠল; সমুদ্রের শিয়রের

কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধ্বনিত হতে লাগল—'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে!'

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে, তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসত্বর ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝলুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'দাদা, ঘুমিয়েছেন কি?' হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে-একজন হুহুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'হুজ দ্যাট!' আমি বললুম, 'বাস্‌রে! এ তো দাদা নয়!' তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্ত স্বরে জ্ঞাপন করলুম, 'ক্ষমা করবেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।' অপরিচিত কণ্ঠ বললে, 'অল রাইট!' কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতরশরীরে সংকুচিতচিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাৎড়ে বেড়াতে লাগলুম। ইঁদুর কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয়

এই অবসরে কতকটা বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এ দিকে লোকটা কী মনে করছে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই— খট্ খট্ শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিসপত্র হাৎড়ে বেড়ানো— এ কি কোনো সদ্‌বংশীয় সাধু লোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠছে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ দ্বার-উদ্‌ঘাটনের গোলকটি, সেই মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচনির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবর্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি আলো জ্বলছে, কিন্তু মেঝের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ -অনুসারে বারবার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বল-চিত্তে জাহাজের কাঠরার 'পরে ঝুঁকে পড়ে শরীর মনের একান্ত উদ্‌বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু, কী সর্বনাশ! এ কার কম্বল! এ তো আমার নয় দেখছি! যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে দশ-মিনিট-কাল অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত ছিলুম, নিশ্চয়

এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্যক হয়, তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দুবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃস্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি! — আরও একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশতঃ দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কিরকমের একটা রোমহর্ষক প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! আর কিছু নয়, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে! প্রথম ক্যাবিন-চারী হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটিকেই বা কী বলব এবং দ্বিতীয় ক্যাবিন-বাসিনী বজ্রাহতা ভদ্ররমণীকেই বা কী বোঝাব? ইত্যাকার বহুবিধ দুশ্চিন্তায় তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগস্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখ-নিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বললুম, 'ভাই, আমার তো এই অবস্থা!' শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপণ করে হাস্যসহকারে এমন দুটো-একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার

ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এ রকম ঘটনা আর কখনো ঘটে নি, সুতরাং শোনবামাত্রই ধারণা হওয়া কিছু কঠিন বটে। অবশেষে বন্ধুতে আমাতে মিলে যখন অনেকটা পরিষ্কার করে বোঝানো গেল, তখন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে— তার পর চলে গেল। কম্বলের কাহিনী অনতিবিলম্বেই সমাপ্ত হল।

কিন্তু সী-সিক্‌নেস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়ীতে ভারতবর্ষের অন্ন আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ করবার পূর্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ করে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট্। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে-ঘটনা বড়ো কম হয় নি সূর্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে— জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল— কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনও মুহূর্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো

রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব, স্থির করতে পারছি নে।

যাই হোক, কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মতো এত বড়ো একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুন জীবাত্মার এতাধিক পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসংগত এবং অগৌরবজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো সুখ নেই -- কারণ, সে নিন্দাবাদে কারও গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না, এবং জগৎরচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সংগীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয় আমার এই সংকীর্ণ শয়নকারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমায় আমার সেই সংগীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম ক'রে কখন্ সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া আর ভৌতিক পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের 'ডেক' অর্থাৎ ছাদের উপর নিয়ে গেলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পুনর্বার এই মর্ত পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাই নে। অতি নিকট হতে

কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ-যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে ক'রে বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করছে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে, বাজি রেখে হার-জিত খেলছে, ধূম্রশালায় বসে তাস পিটচ্ছে--তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালী তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে থাকি।

আমার বন্ধুর দোষগুণ সমালোচনা করতেও আমি চাই না। ত্রেতাযুগে রাজার পক্ষে প্রজারঞ্জন যেমন ছিল, কলিযুগে লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোরঞ্জন সেই রকমের একটা পরম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার প্রজারঞ্জনকার্যে রামভদ্র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এখনকার পাঠকরঞ্জনকার্যে লেখকদের অনেক সময়ে আত্মীয়বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত আত্মীয়েরাও পাঠকশ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ সময়েই নন সে কথা সত্য, কিন্তু তাঁরা নিজে যখন বর্ণনার বিষয় হন তখন আত্মীয়রচিত প্রবন্ধও পাঠ করে থাকেন।

কিন্তু যে বন্ধুর বর্ণনা করবামাত্র বিচ্ছেদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে শাস্ত্রমতে তাঁকে সৎসঙ্গ বলা যায় না। অতএব আমার বন্ধু সম্বন্ধে আমি সেরকম আশঙ্কা করি নে। কিন্তু পাঠকের মনোরঞ্জনকেই যদি প্রধান উদ্দেশ্য করা যায়, তবে নিছক প্রশংসায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। নিদেন বানিয়ে দুটো নিন্দে করতে এবং শানিয়ে দুটো কথা বলতে হয়। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার যদি থাকে আমার বন্ধুর থাকতেও আটক নেই। অতএব মৌনাবলম্বনই ভালো।

জাহাজে আমরা দীর্ঘদিন দুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে

পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সৃষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে ফেলেছি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব ধূম্রলোক সৃজন করেছেন। সেগুলোকে যদি মস্ত একটা ফুলো রবারের থলির মধ্যে বেঁধে রাখবার কোনো সুযোগ থাকত তা হলে সমস্ত মেদিনীকে বেলুনে চড়িয়ে একেবারে ছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতে পারত। সাধারণতঃ কাল্পনিকেরা যখন কল্পনাক্ষেত্রের হাওয়া খেতে চায় তখন তারা পৃথিবী ছেড়ে হুস করে উড়ে এক আজগবি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার বন্ধুর পদ্ধতি অন্য রকম। তিনি তাঁর প্রবল ধূম্রশক্তির উপরে ফুল ফোর্‌স্ প্রয়োগ করে পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকাপিণ্ড একেবারে সঙ্গে করে উড়িয়ে নিয়ে যান। গুরু লঘু কিছুই ছাড়েন না। যখন এত ঊর্ধ্বে ওঠা গেছে যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক হাওয়ায় আর নিশ্বাস চলে না, সেখানে তিনি হঠাৎ তাঁর থলির মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক হাওয়া বের করে দিয়ে আশ্চর্য করে দেন। যখন জগতের ডগার উপর চড়ে আধ্যাত্মিক ভাবে একেবারে বিন্দুবৎ হয়ে মিশিয়ে গেছি, তখন তিনি কোথা থেকে তার গোড়াকার মৃত্তিকা তুলে এনে আগা ও গোড়ার সামঞ্জস্য-প্রমাণে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য কল্পনাবিহারীগণকে মাঝে মাঝে মেঘ থেকে হঠাৎ মাটির উপরে ধুপ করে নেমে পড়তে হয়, কিন্তু তাঁর সেই গুরুতর পতনের আবশ্যক হয় না। তিনি একই সময়ে স্বর্গমর্ত গদ্যপদ্যর প্যারাডক্স্-লোকে ইন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এক কথায়, এক দিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হয়ে ওড়বার উদ্যম, অন্য দিকে তেমনি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা

অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে। তাঁর তামাকের থলি, সিগারেটের কাগজ এবং দেশালাইয়ের বাক্স মুহূর্তে মুহূর্তে হারাচ্ছে, অসম্ভব স্থানে তার সন্ধান হচ্ছে এবং সম্ভব স্থান থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে। পুরাণে পড়া যায় ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে— যিনি যজ্ঞ করেন বিঘ্ন ঘটিয়ে তাঁর যজ্ঞ নাশ করা, যিনি তপস্যা করেন অপ্সরী পাঠিয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করে রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁর কোনো এক সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। ছলনাপ্রিয় ললনার মতো তাঁর সিগারেট মুহুর্মুহু কেবলই লুকোচ্ছে এবং ধরা দিচ্ছে এবং তাঁর চিত্তকে অহর্নিশি উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক করে দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোনো ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে হরিণশাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোনো-এক কৃষকের কুটিরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হয়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেন নি।

২৭।২৮ আগস্ট্। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন। মন্দর পর্বত কোথায় জানি নে এবং শেষনাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করছেন, কিন্তু

সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণীবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নরজঠরধারীমাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুর -বংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের, অর্থাৎ তিনিও করেন না।

আমি মনে মনে তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। আমি যখন বিনম্রভাবে বিছানায় পড়ে পড়ে অনবরত পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণনার সত্যতা সশরীরে সপ্রমাণ করছিলুম তিনি তখন স্বচ্ছন্দে আহারামোদে নিযুক্ত ছিলেন —এটা আমার চক্ষে অত্যন্ত অসাধু বলে ঠেকেছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবতুম এক-একটা লোক আছে শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মবাক্যও তাদের উপর খাটে না। প্রাচীন মন্থনের সমসাময়িক কালেও যদি আমার এই বন্ধুটি সমুদ্রের কোথাও বর্তমান থাকতেন তা হলে লক্ষ্মী এবং চন্দ্রটির মতো ইনিও দিব্য অনাময় সুস্থ শরীরে উপরে ভেসে উঠতেন, কিন্তু মন্থনকারী উভয় পক্ষের মধ্যে কার ভাগে পড়তেন আমি সে কথা বলতে চাই নে।

কিন্তু রোগশয্যা ছেড়ে এখন ডেকে উঠে বসেছি, এবং শরীরের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র এবং আমার সঙ্গীটির সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রীয় মত এবং অশাস্ত্রীয় মনোমালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। এমন-কি বর্তমানে আমি তাঁদের কিছু অধিক পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

এ ক'টা দিন দিনরাত্রি কেবল ডেকেই পড়ে আছি। তিলমাত্র কাল বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নি।

রোগ কেটে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি, শরীরের এই রকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য আছে। এই সময়ে পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, সূর্যালোক, সবসুদ্ধ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমার প্রতি-

দিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুকালের মতো বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আবার যেন নবপ্রেমিকের মতো উভয়ের মধ্যে মৃদু সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্তা জানাশোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হতে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য নববধূর মতো নানা নূতন ভাবে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে, পুলকিত দেহ তার আদরের স্পর্শ প্রত্যেক রোমকূপের দ্বারা যেন শোষণ করে পান করতে থাকে।

সকল প্রকার সন্ধিস্থলের মধ্যেই একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে। দিনের মধ্যে যেমন উষা এবং সন্ধ্যা। বাল্য ও যৌবনের বয়ঃ-সন্ধিকাল কবি বিদ্যাপতি সমধিক আগ্রহের সহিত বর্ণনা করেছেন। প্রবাদ আছে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। এবং অনেকে ব'লে থাকেন ধনের চেয়ে সচ্ছলতার মধ্যে বেশি আনন্দ আছে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের চেয়ে রোগ ও স্বাস্থ্যের মধ্যবর্তীকালে একটু বিশেষ সুখ আছে।

আজ কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে এর একটা তত্ত্বনির্ণয় করেছি। ধনই বলো, সুখই বলো, স্বাস্থ্যই বলো, তারা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত না হলে আমরা তাকে ধন সুখ স্বাস্থ্য বলে স্বীকার করি নে। প্রতিদিনের সংসার যাতে চলে তার চেয়ে বেশি যার নেই তাকে আমরা ধনী বলি নে। সন্তোষ এবং সুখের মধ্যেও প্রভেদ এই যে, একটি হচ্ছে যথেষ্ট, আর-একটি হচ্ছে তারও বেশি। এবং দেহধারণের পক্ষে ঠিক যতটা আবশ্যক স্বাস্থ্য তার চেয়ে অনেক অধিক।

এই অতিরিক্ত সঞ্চয় হাতে থাকাতে আমরা কতকগুলি সুখ থেকে বঞ্চিত হই। প্রাত্যহিক অভাব প্রত্যহ মোচনের সুখ ধনী জানে না। তার চেয়ে ঢের বেশি অভাব মোচন না হলে ধনীর মনে তৃপ্তির উদয় হয় না। সুখের উত্তেজনায় যার রক্ত ফুটে উঠেছে, জগতের শতসহস্র সহজ আনন্দে তার চেতনা উদ্রেক করতে পারে

না। তেমনি স্বাস্থ্যের বেগে যার শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শান্ত নিরুদ্‌বিগ্নভাবে কেবলমাত্র জীবনধারণের মধ্যে যে সুখটুকু আছে সে তাকে এক লম্ফে লঙ্ঘন করে চলে যায়।

ধনই হোক, সুখই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, যতটুকু আমাদের প্রাত্যহিক আবশ্যকে লাগে ততটুকু নিয়মিত কাজে ব্যাপৃত থাকে। তার অতিরিক্ত যেটুকু সেইটুকুই আমাদের অস্থির করে তোলে। সে কিছুতে বেকার বসে থাকতে চায় না। ধন ধনীকে কেবল প্রশ্ন করে, খাওয়া পরা তো হল, এখন কী করব বলো। সুখ বলে, প্রাত্যহিক জীবনটা তো এক রকম নিঃশব্দে কাটছে, এখন তার উপরে একটা-কিছু সমারোহ না করলে টিঁকতে পারি নে। স্বাস্থ্য বলে, আর-কিছু যদি করবার না থাকে তো নিদেন দুদুঃ শব্দে দুটো ডন ফেলে আসা যাক।

সেই জন্যেই আমরা ভারতবাসীরা বলে থাকি সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, অনুরাগের চেয়ে বৈরাগ্যে ঢের কম ল্যাঠা — ভিতর থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে মারবার কেউ থাকে না। সুখ দুর্বলের জন্যে নয় — সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্সিজেন প্রতি মুহূর্তে যেমন আমাদের দগ্ধ করে জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেই রকম আমাদের দাহ করতে থাকে। যৌবনে এই দাহ যে রকম প্রবল বার্ধক্যে সে রকম নয়; এই জন্যে বৃদ্ধ জাতি এবং বৃদ্ধ লোকেরাই বলে থাকেন, সন্তোষই যথার্থ সুখ, অর্থাৎ তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন।

য়ুরোপ মনুষ্যের নব নব অভাব সৃষ্টি ক'রে সেইটাকে মোচন করাকেই সুখ বলে, আমরা মনুষ্যের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি চিরসঙ্গী আজন্ম-অভাবগুলিকেও খোরাক-বন্ধ ও অন্যান্য কৌশল -দ্বারা হ্রাস করে বসে থাকাকেই সন্তোষ বলি।

আমি সেই প্রাচীন ভারত -সন্তান। পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে লম্বা চৌকির উপর হেলান দিয়ে ভারতমাতার আর-একটি দুর্বল সন্তানকে সামনে বসিয়ে প্রত্যূষ থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কখনো স্বগত তত্ত্বালোচনা, কখনো জনান্তিকে গল্প, কখনো নিস্তব্ধভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকাকেই পরম সুখের অবস্থা মনে করছি। শরীরে যতটুকু তেজ আছে তাতে কেবল এইটুকুমাত্রই সম্পন্ন হতে পারে। আর, ঐ ইংরাজের ছেলেগুলো আমাদের সম্মুখ দিয়ে অবিশ্রাম পায়চারি করে করে মোলো। তাদের অপরিমিত স্বাস্থ্য কিছুতেই তাদের বসে থাকতে দিচ্ছে না; পিছনে পিছনে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে আমরা আমাদের নিবৃত্তি-সিংহাসনের উপরে রাজবৎ আসীন হয়ে ভারতবাসীর নির্‌গুণাত্মক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করছি। এবং মনে হচ্ছে ইংরাজের ছেলেরাও আমাদের এই অটল ঔদাসীন্য এই নিশ্চেষ্ট অনাসক্তি দেখে নিজেদের হীনতা স্পষ্টই বুঝতে পারছে, তাই আরও ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাহ্য আকৃতি থেকে আমাদের দুটিকে দিবসের পেচকের মতো যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থাকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি। এখনো আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের সময় আছে। এই বয়সেই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে বৈরাগ্য হাড়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়, কিন্তু মনের মধ্যে এখনো কিঞ্চিৎ উত্তাপ আছে। এই জন্যে আমরা দুই যুবক গতকল্য রাত্রি দুটো পর্যন্ত কেবল ষড়্‌চক্র-ভেদ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ত্রিগুণাত্মিকা-শক্তি

সম্বন্ধে আলোচনা না করে সৌন্দর্য প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম এবং মনে করছিলুম আমাদের বয়সী যুবকদের পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই জ্যাঠামি এবং সেটা কেবল আজকাল বাংলাদেশেই প্রচলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই ইংরাজিশিক্ষা লাভ করেছি, অতএব আমাদের এ প্রকার মনের ভাবকে যদি কেউ দূষণীয় জ্ঞান করেন তবে সেটা বিদেশী শিক্ষার দোষ বলে জানবেন। তাঁরা যে প্রকার শিক্ষা দিতে চান তাতে মনুষ্যসমাজ বাল্য যৌবন সম্পূর্ণ ডিঙিয়ে একেবারে বার্ধক্যের সুশীতল কূপের মধ্যে সমাহিত হয়ে বসে। জীবনসমুদ্রের অসীম চাঞ্চল্য তার মধ্যে স্থান পায় না।

২৯ আগস্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি-একটি করে পাহাড় পর্বতের রেখা দেখা যাচ্ছে।

জ্যোৎস্নারাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাতের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্যবিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্নমরীচিকার মতো লাগছে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন-চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দয় ভাবে নৃত্য করে বহু কষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা প্রকারের

বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে নৌকারোহণপূর্বক নূতন জাহাজ 'ম্যাসীলিয়া' -অভিমুখে চললুম।

অনতিদূরে মাস্তুলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলির সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত করে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতিপ্রকাণ্ডকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধ ভাবে ভাসছে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড্ বেজে উঠল। সংগীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-নিশীথে মনে হতে লাগল, অর্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য-উপন্যাসের মতো কী-একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে।

ম্যাসীলিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখছে। কিন্তু সে রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিন জনের সব চেয়ে জিত। বহু কষ্টে জিনিসপত্র উদ্ধার করে ডেকের উপর যখন উঠলুম মুহূর্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হল। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তা হলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সংগীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগস্ট্। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর-একটি দোতলা ডেকের মতো আছে। সেটি ছোটো এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপসা দেখাচ্ছে, একটা মধ্যাহ্নতন্দ্রার ছায়া পড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

খানিকটা ভাবছি, খানিকটা লিখছি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতো মোজা খুলে ফেলে তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করছে— তাদের তিনটি দাসী বেঞ্চির উপরে বসে নতমুখে নিস্তব্ধভাবে সেলাই করে যাচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

বহু দূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক-একটা পাহাড় জেগে উঠছে— অনুর্বরকঠিন, কালো, দগ্ধতপ্ত, জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সামনে দিয়ে কে আসছে কে যাচ্ছে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এই রকম করে ক্রমে সূর্যাস্তের সময় হল। 'কাস্‌ল্‌ অফ ইন্‌ডোলেন্‌স্‌' অর্থাৎ আলস্যের আলয়, কুঁড়েমির কেল্লা, যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্ছে জাহাজ। বিশেষতঃ গরম দিনে, প্রশান্ত লোহিত সাগরের উপরে। অস্থির ইংরাজতনয়রাও সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাস্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলছে এবং তার তুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনো মতে একটুখানি মাত্র সরে যাচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রঙ দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত থম্‌থম্‌ করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ

এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই— যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সূর্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে-একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতল রেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেই রকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়ে তাকে অপূর্বমহিমান্বিত করে তুলেছে।

সমুদ্র এবং আকাশের অসীম স্তব্ধতার মধ্যে এই আশ্চর্য বর্ণের উদ্ভাস দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এইটেকে ঠিক ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা আমার কোথায়! কিন্তু আবার ভাবি, আবশ্যক কী? এ চঞ্চলতা কেন? বৃহৎকে ছোটোর মধ্যে বেঁধে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে এ কী রকমের দুশ্চেষ্টা! এই দুর্গম দুর্লভ বাক্যহীন এবং অনির্বচনীয় প্রকাণ্ড সুন্দরী প্রকৃতির একটি পকেট-সাইজের সুলভ সংস্করণ জেবের মধ্যে পূরতে না পারলে মনের ক্ষোভ মেটে না; মাঝের থেকে এই ছট্‌ফটানির জ্বালায় যতটুকু সহজে পাওয়া যেতে পারত তাও হাতছাড়া হয়!

কিন্তু তবু— সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মতো তুলে নিয়ে যদি আর-এক জনের হাতে না দিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিষ্ফল হল। এই আলো এই শান্তি কেবল একা বসে চেয়ে দেখবার এবং

মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, মানুষের উপর নিক্ষেপ করে তাকে আচ্ছন্ন করে তাকে সুন্দর করবার জন্যে। ঘরের মধ্যে আনবার জন্যে, লোকালয়ের উপরে বিস্তৃত করবার জন্যে, ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখবার জন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে গেল। সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধ ঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজল। নরনারীগণ দলে দলে ভোজন-শালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ছোটো টেবিল অধিকার করে বসলুম। আমাদের সামনে আর-একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেছেন।

চেয়ে দেখলুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুল পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষ-বাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষ-মণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মতো চারি দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন-কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্বত্র একটা হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে 'ইন্‌ডেকোরাস' বলে উল্লেখ করছে। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারও বিস্ময় উদ্রেক করে না। যেখানে সদ্যঃপরিচিত স্ত্রীপুরুষে পরস্পর আলিঙ্গনপাশে নিবদ্ধ হয়ে উন্মত্তের মতো নৃত্য

করে বেড়ায় সেখানে ভদ্র কুলস্ত্রীদের শরীর থেকে লজ্জা এবং বসন অনেকটা পরিমাণে উন্মুক্ত করে ফেলা যদি দোষের না হয়, তবে এই ভোজনসভাতে আপনার পূর্ণমঞ্জরিত দেহসৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে যাওয়া এমনি কী দোষের!

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে দেখা যায় বাসরঘরে এবং কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্য কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দূষ্য হ'ত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি থাকে তেমনি মাঝে মাঝে ছুটো-একটা ছুটিও থাকে, নইলে পাছে চঞ্চল মানবস্বভাব সমাজভিত্তির মধ্যে শত শত গোপন ছিদ্রপথ খনন করে! ইংরাজিতে যাকে 'ফ্লার্টেশন' বলে আমাদের সমাজে তা প্রচলিত নেই, সুতরাং তার কোনো নামও নেই, কিন্তু গৃহের মধ্যে এমন অনেকগুলি পরিহাসের স্থল রাখা হয়েছে যেখানে অনেক পরিমাণে সমাজনিয়মের সমাজসম্মত লঙ্ঘন চলতে পারে। সেখানে যে রকম রসালাপপূর্ণ অভিনয় চলে তা যে সকল সময়ে সুসম্বৃত সুশোভন তা বলা যায় না।

কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যতই চেষ্টা করুক আবরণহীনতা সম্বন্ধে কিছুতেই আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এ সম্বন্ধে মানবের যতদূর সাধ্য আমাদের দেশে তার ত্রুটি হয় নি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপূর্ব কারুকৌশলে আমাদের স্ত্রীসমাজে বসন থেকে আবরণের অংশ যতদূর সম্ভব ছাড়িয়ে ফেলা যেতে পারে তা ফেলা হয়েছে। বস্ত্র-পরিধানের দ্বারা অঙ্গকে অনাবৃত করা বঙ্গ-অন্তঃপুরে আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু একটা কথা বলা আবশ্যক; ইংরেজ-মেয়েদের পক্ষে শরীরের উত্তরভাগ বিশেষরূপে অনাচ্ছন্ন করার

মধ্যে একটা চেষ্টা চেতনা চাতুরী লক্ষিত হয়। আমাদের মেয়েরা যে উলঙ্গতা পরিধান -পূর্বক অষ্টপ্রহর বিচরণ করে থাকেন তার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য চেষ্টা কিম্বা চেতনা নেই, এই জন্যে আমাদের চোখে সেটা সচরাচর বিবসনতা বলে ঠেকে না। অবশ্য, সময়-বিশেষে তাঁরা-যে দ্রুত হস্তক্ষেপে মস্তক বেষ্টন করে প্রায় নাসিকার প্রান্তভাগ পর্যন্ত ঘোমটা আকর্ষণ করে দেন না এ রকম ঘোরতর নির্লজ্জতার অপবাদ তাঁদের কেউ দিতে পারে না।

৩১ আগস্ট্। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃস্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু এই-যে দৃশ্য — এই-যে গুটি-কতক চঞ্চল ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক-একবার অট্টহাস্য শোনা যাচ্ছে। গতরাত্রের সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করে উঠছেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্ স্বরে ধর্মসংগীতেও যোগ দিচ্ছেন। আমার মনে হল সরল ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে শয়তান পেটিকোট প'রে এসে মানবের উপাসনাকে পরিহাস করছে।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোটো টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেক্‌ফাস্ট্ খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা করতে গিয়ে

ছুরিটা সবলে পিছ্‌লে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়ল। রক্ত চার দিকে ছিটকে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। মনে এই আক্ষেপ হতে লাগল, এতখানি রক্তের অনর্থক অপব্যয় হল অথচ স্বদেশ যেমন ছিল তেমনি রইল, সাধারণ মানবেরও অবস্থার কোনো উন্নতি হল না, মাঝের থেকে এই ঘটনাটা যদি বাড়িতে ঘটত তা হলে যে পরিমাণ স্নেহ শুশ্রূষা এবং ছিন্ন অঞ্চলখণ্ড আহত অঙ্গুলির চতুর্দিকে আকৃষ্ট হত অদৃষ্টে তাও জুটল না। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েছে, আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখলুম— ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই, বর্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার 'আহা' বলেন!

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন, এবং দাদা অলসভাবে ধূম সেবন করছেন, এমন সময়ে নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ প'ড়ে একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন্‌-এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। আর, মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে ধ'রে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে,

উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, সর্বাঙ্গের রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে মাথার মধ্যে ঘুরছে, বিশ্বজগৎ আদিসৃষ্টিকালের বাষ্পচক্রের মতো চারি দিকে প্রবল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে গম্ভীর সমস্বরে অনন্তকালের পুরাতন সামগাথা গান করছে। এই রজনীতে, এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে, কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত নরনারী জুড়ি জুড়ি জড়াজড়ি ক'রে লাঠিমের মতো অর্থহীন অন্ধবেগে ঘুর খাওয়াকে খুব একটা সুখ মনে করছে। একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমার কাছে এই উন্মত্ত বর্বরতা লেশমাত্র সুন্দর ঠেকে না। লজ্জা কি কেবলমাত্র কৃত্রিম নিয়ম! অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ অকস্মাৎ ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধনে মুখে মুখে বক্ষে বক্ষে সম্বদ্ধ হতে কি একটা স্বাভাবিক আন্তরিক সুগভীর সংকোচ অনুভব করে না! এমন-কি, যে দেশে অসভ্যেরা বস্ত্রমাত্র পরে না সে দেশেও কি এই আদিম লজ্জাটুকু, প্রেমনীতির এই প্রথম অঙ্কুরটুকুও নেই!

২ সেপ্টেম্বর। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বহুক্ষণ আলাপ হল। ইনি ভারত-রাজ-মন্ত্রণার একটি প্রধান আসন অধিকার করেন। প্রথমে য়ুরোপের সমাজসমস্যা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলুম, তার কতক কতক আমার ভূমিকাতে ব্যক্ত করা গেছে। সাহেব জনসংখ্যাবৃদ্ধি-বশতঃ বেহার প্রভৃতি দরিদ্র দেশের ভাবী আশঙ্কা এবং কুলি-চালান সম্বন্ধে বাঙালী কাগজের অনভিজ্ঞ চীৎকারের কথা বললেন; এবং দেশের ঐতিহাসিক প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিতন্ত্র-প্রচার সম্বন্ধে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করলেন।

আমি বললুম, 'দেখো সাহেব, প্রতিনিধিতন্ত্রের জন্য যে আমরা আন্তরিক লালায়িত এরূপ কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আসল কথা, তোমরা সর্বদা আমাদের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকো, সেইটেই আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি ব'লেই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে আজ এত চেষ্টা করছি। নইলে, তোমাদের জাতের স্বভাবটা যদি একটু নরম হত— আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে যথার্থ ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদয় ব্যবহার পেতুম— তা হলে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে থেকে এ রকম বেদনার স্বর শুনতে পেতে না। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান দুর্দশা হচ্ছে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না তারাই আমাদের শান্তি রক্ষা করে, লেখাপড়া শেখায়, সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এ রকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না। স্নেহের দানে হীনতা নেই। স্নেহের সম্পর্কে সহস্র অবিচার থাকতে পারে কিন্তু অপমান নেই। ধনীগৃহের একটি অনাদৃত উপেক্ষিত আশ্রিতের মতো আমরা পাকা কোঠায় থাকি, উদ্‌বৃত্ত পরমান্ন খাই, সুখ বিস্তর আছে কিন্তু হীনতার আর সীমা নেই— সে কেবলমাত্র আন্তরিক প্রীতি-বন্ধনের অভাবে।

৩ সেপ্টেম্বর। আজ সকালেও সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। তিনি লর্ড্ ডাফারিনের বিদায়কালে তাঁর প্রতি বাঙালী দেশহিতৈষীদের রূঢ় আচরণের অনেক নিন্দাবাদ করলেন।

বেলা দশটার সময় সুয়েজ খালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থামল। চারি দিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র

ছায়া এবং নীল বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চলছে। দু ধারে তরুহীন বালি। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো ছোটো কোটাঘর বহুযত্নবর্ধিত গুটিকতক গাছে-পালায় বেষ্টিত হয়ে বড়ো আরামজনক দেখাচ্ছে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূ ধূ করছে।— রাত দুটো-তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট্ সৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে এসেছে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট দ্বীপের তটপর্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। জাহাজে এক দল নাট্যব্যবসায়ী যাত্রী আছে, তারা অভিনয় করবে। অন্য দিনের চেয়ে সকাল-সকাল ডিনার খেয়ে নিয়ে তামাশা আরম্ভ হল। প্রথমে জাহাজে অব্যবসায়ী যাত্রীর মধ্যে যাঁরা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না; তাঁদের কারও বা দুর্বল পিয়ানো টিংটিং কারও বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে নট-নটী-কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সঙ নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন-অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শক-দের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জানলার কাছে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখলুম 'আয়োনিয়ান' দ্বীপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই

মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মতো দেখা যাচ্ছে। এইটি হচ্ছে জান্তি শহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পর্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করছে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ রক্তবর্ণ ইঙ্গিত-অঙ্গুলি এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারী ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিশি পৌঁছব। জিনিসপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিশি পৌঁছনো গেল। মেল-গাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুই ধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জল-পাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল -বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো ঊর্ধ্বমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের

ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ; শাদা শাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চর্চ-চূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্রদর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, জলপাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড-প্রস্তরের-বেড়া-দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো-একটা সঙ্গীহীন ছোটো শাদা বাড়ি।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্টি টস্‌টসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাথায়-রঙিন-রুমাল-বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালী-য়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ— এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রঙ, অতি বেশি শাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেছি; আমাদের ঠিক নীচেই ডান দিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকা ডাঙার উপর তোলা। নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গোরু চরছে, কী খাচ্ছে তারাই

জানে— মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনারে বসেছি, এমন সময় গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। এক দল নরনারী প্ল্যাট্‌ফর্মে ভিড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল। তারই মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি-একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি-রুমাল-আন্দোলন, অনেক চুম্বনসংকেত-প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি-প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারি দিকে আঙুর জলপাই ভুট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি ক্ষেত-ময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারই উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে এক-একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটির: এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধ'রে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি ছোটো বালিকা একটা

প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধ'রে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলাদেশের নবদম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চশমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট-পুঙ্গব এবং তারই দড়িটি ধরে ছোটো একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলক-পরা নববধূ— জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

ট্যুরিন স্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিশম্যানের সাজ দেখে অবাক হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা তলোয়ার, সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মনে হয়। আমাদের দেশে এ রকম জমকালো পাহারাওয়ালা থাকলে আমরা সর্বদা ডরিয়ে ডরিয়ে আরও কাহিল হয়ে যেতুম।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী দেখা দিয়েছে। বামে ঘনচ্ছায়া স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত -সমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গ-শিখর, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্য পর্বত ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি-আধটি চর্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল-কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্ধ্বমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্ছে। পার্বত্যপথ সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। ঢালু পাহাড়ের উপর চষা ক্ষেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্ সেনিসের বিখ্যাত

দীর্ঘ রেলওয়ে-সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল।

এইবার ফ্রান্স্। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো দ্রুত, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, হাস্যপ্রিয়, কলভাষী। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক নির্মল এবং শিশুস্বভাব।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিস কিছু আছে কি না— আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরাজ বললেন : I don't parlez-vous francais.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্বতীরে 'ফার' অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে-চুরে, ফেনিয়ে-ফুলে, নেচে, কলরব ক'রে, পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে, রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে এক-একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটি-দেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন ক'রে দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে ঝর্না এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্বতীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্ররেখাঙ্কিত পাষাণকঙ্কাল প্রকাশ করে নগ্ন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা করে অরণ্যের

খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। ফরাসী ললনার মতো বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয়তো যেতে যেতে কোন্-এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক-সবজি। মনে হয় কেবলই বাগানের পর বাগান আসছে। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ ক'রে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তার আর কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনাব দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান-প্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে —য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয়? আমরা তো জঙ্গলে থাকি;

খাল বিল বন বাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। ক্ষেত থেকে দুমুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভ'রে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুকনো কাঠকুটু সংগ্রহ করে এক বেলা অথবা দু বেলা কোনো রকম করে আহার চলে যায়। ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্‌বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য ক'রে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু, একি চমৎকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে, পপ্লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর গুহাগহ্বর বন'বাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কী?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন প্যারিসে যায় না— একটু পাশ

কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্তী স্টেশনে স্পেশল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা গেল।

রাত দুটোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিসপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্ট্ ক্লাস এবং একটি ব্রেক্‌ভ্যান। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ স্টেশনে পৌঁছনো গেল। সুপ্তোত্থিত দুই-একজন 'ম্যসিয়' আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম হৌসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনূতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুত্‌জ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা— বিহগ-পক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশপরিবর্তন-পূর্বক শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-এক জনের ওভার্‌কোট গাত্র-বস্ত্র। আমরা তিন জনেই পরস্পরের জিনিস চিনি নে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারও-না-কারও স্থির করে অসংশয়ে সংগ্রহ করে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিস পৃথক করে নেবার পর যখন দুটো-চারটে উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া যায়, তখন তা আর পূর্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। ওভার্‌কোটটি রেল-গাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর

নিকটবর্তী হয়েছে। লোকটি কে এবং সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায় আমরা কিছুই জানি নে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্ছি— প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্ছে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ কুর্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরবর্তী শয্যা অধিকার করে ছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইন্‌ডীয় পুলিস-অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ ক'রে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন দেখবে এক যাত্রায় একই রকম ঘটনা একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে দুই-দুইবার সংঘটন হল তখন আর যাই হোক কখনোই আমাকে সে ব্যক্তি সুশীল সচ্চরিত্র বলে ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রত্যুষে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু যখন তার হৃতকুর্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে তুলবে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস চতুর্‌গুণ কম্পিত হতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্ট্‌ম্যাণ্টো পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে তিনটি লোক পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছি, তিনজনেই প্রায় সমান। আমার বোধ হচ্ছে, মাস তিনেক পরে যখন জন্ম-ভূমিতে ফিরব তখন দেখতে পাব আমাদের নিজের আবশ্যকীয় যে ক'টি জিনিস সঙ্গে এনেছিলুম তার একটিও নেই এবং পরের অনাবশ্যক স্তূপাকার জিনিস কোথায় রাখব স্থান পাচ্ছি নে, মাশুল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যাকুল হয়ে ভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে বহুব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

যা হোক, পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে আমরা তিন জনে

প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজনগৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ দেখতে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চ'ড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে এক দিনে তাড়াতাড়ি চক্ষুদ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মতো বদ্ধ পাল্কির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মতো— কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্ট্ম্যাণ্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃত কোর্তা সম্বন্ধে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লন্ডন-অভিমুখে চললুম। সন্ধ্যার সময় লন্ডনে পৌঁছে দুই-একটি হোটেল অন্বেষণ করে দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্রপরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লন্ডনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা

করলুম কোথায় থাকেন ? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে— সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই— সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিক ক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লন্‌ডনের বাইরে কোন্‌-এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। ভারী নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম— আমার সেই অমুক এখানে আছে তো ? দ্বারী উত্তর করলে— না, সে অনেক দিন হল চলে গেছে। চলে গেছে ? সেও চলে গেছে ! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময়-অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই-সমস্ত জানা লোকেরা আর-কেহ কারও ঠিকানা খুঁজে পাবে না ! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি এমন সময়ে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন— জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে ! আমি নমস্কার করে বললুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী। কেমন করে প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল ! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি— আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই-যে ঘরের সম্মুখে বারান্দার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ

গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়তো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কারও মনেও পড়ে নি!

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলুম না। আমাদের গাড়ি মিস শ—য়ের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। গিয়ে দেখলুম তিনি নির্জন গৃহে বসে একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত আছেন। জল বায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য, এবং কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লন্‌ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতালবাষ্পযান চলে তাই অবলম্বন করে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ-নামক দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করা সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যে দিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সে দিকে নয়। পুনর্বার তিন-চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে-তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্ট্যান্‌লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয়ই অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন-না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাকেই আমাদের লন্‌ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা

যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক, এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে— কিন্তু, ভাগ্যিস আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্ত মনে শহর ঘোরা গেল। ন্যাশনাল গ্যালারিতে ছবি দেখতে গেলুম। বড়ো ভয়ে ভয়ে দেখলুম। কোনো ছবি পুরোপুরি ভালো লাগতে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোনো প্রকৃত সমজদারের এ ছবি ভালো লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভালো লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারি নে।

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে 'গন্‌ডোলিয়ার্‌স্‌'-নামক একটি গীতিনাট্য-অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। আলোকে, সংগীতে, সৌন্দর্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল একটা কোন্‌ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্তক-নর্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারি দিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে কিন্নরলোক থেকে সৌন্দর্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। যেন, হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে সুন্দর নরনারীর একটা উলট-পালট ঢেউ উঠেছে— তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারি দিকে ঠিকরে পড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্বশ্রুত সুর পিয়ানোয় বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগল। সেই ভারতবর্ষের

রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সংগীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্তা আমরা বহন করে করে বেড়াচ্ছি, ইন্‌ডিয়া আপিস -যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে — আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে 'ভ্রমক্রমে' বলে একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা আমার মনে হল মৌখিক শিষ্টতা মাত্র। একটা সন্তোষের বিষয় এই, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ-পল্লববিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র— দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন, কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে— সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। ঈফেল স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এ দেশে এসে কিছু বাহুল্যপরিমাণে দেখতে পাই। এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর যেমন

সম্মুখবর্তী হই অমনি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে দিতে ইচ্ছা করে, সুন্দরি, আমি হাসি ভালোবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক-না কেন, তারও একটা যুক্তিসংগত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাব্জ-নয়নে, আমি তো ইংরাজের মতো অসভ্য খাটো কুর্তি এবং অসংগত লম্বা ধুচুনি-টুপি পরি নে, তবে হাসো কী দেখে? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ—কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে বলতে পারি, বিদ্রূপের তূলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রঙটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে হাসি পায় তা হলে এই পর্যন্ত বলতে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচি-ভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে হিউমার বলো, আমার মতে, কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাংলা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই-তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেছেন: বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। এঁরা একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার আমাদের রাজকুল ইংরাজ-কুলও বটেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিসপত্র কিনে

দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এসো বিশ্রাম করি গে। তার পরে আমরা খুব সমারোহের সহিত বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে আমার বান্ধব অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, আমরা কোনো বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি; নাহয় দুজনে মিলে জগতের যত-কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই। আজকাল এইভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করছি যে, কাজের আর তিলমাত্র অবকাশ থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাই নে— আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হতেও আমরা বঞ্চিত— আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে থাকি। রাত দুটো বাজল, আলো নিবি[illegible] দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই— আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটোখাটো এক্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, এটা প্যারিস এক্‌জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ ক'রে, কারোলু ড্যুরাঁ -নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর -রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মতো সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর-কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে

দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখলে চেতনা হয় পশু-মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে রেখেছে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের আশ্চর্য আভাস দিয়ে দিলে। যবনিকার এক প্রান্ত তুলে ধরে বললে, দেখো, তোমরা কোন্ লক্ষ্মীকে অন্ধকারে নির্বাসিত করে রেখেছ! এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে সেই অসীম-সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে— কিন্তু এতে আরও অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূর থেকে চকিতের মতো মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্বচনীয় চিররহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট-রচিত ‘ব্রাইড অফ লামার্‌মূর’ উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কী-এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসেছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁত সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে— বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের

সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল এবং সেই আলো স্টেজের অনতিদূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল, তখন তার আলোকিত সুন্দর সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন— অভিনয়কালে বারবার সে দিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসংকোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলো অভদ্র প্রথা আছে— যত কালই এদের সংসর্গে থাকি সেগুলো আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে না যায়। যেমন ঘূর্ণী নাচ— বিশেষতঃ ওয়ালট্‌জ্‌, মেয়েদের নাচ-বস্ত্র, পুরুষদের খাটো কুর্তি, নাট্যশালায় দূরবীন কষা, নিমন্ত্রণসভায় কাউকে গান-বাজনায় প্রবৃত্ত করে দিয়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেছেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্কফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক সবজি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লন্‌ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ-ভোজের ভোজনশালা আছে, সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা-কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অসংকোচে সাক্ষাৎ করেন। কিরকম করে কথাবার্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে আসেন। ইতিমধ্যে এক্‌জিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে এসেছেন এবং অবসরমত অ্যামেরিকায়

যাবার সংকল্প করছেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাংলা শিক্ষা করে অনেক ভালো বাংলা বই গুজরাটিতে তর্জমা করেছেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে সেটা সেখানকার সাহিত্য প'ড়ে। অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ মাস কিম্বা ছ বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা। লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য হোক-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না, বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে— আচ্ছা, ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি

বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তা হলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ, সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যাবরণ দূর করে অন্তরঙ্গ মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। তখন ভ্রম হয় ইংলন্ডে পদার্পণ করবামাত্রই এই-সব মানুষের সঙ্গে বুঝি পথে ঘাটে সম্মিলন হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরাজ, কেবল বিদেশী; তাদের চালচলন ধরণধারণ যা-কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে থাকে; সেইজন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে, কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।—

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড়ো বড়ো থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বললে, 'ভাই, এসো, আরম্ভ করে দেওয়া যাক।' ব'লেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য অবলম্বন -পূর্বক সরোবর-কূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত

করে বলছিল, ভাই, খাচ্ছ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল! তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি! বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, আহা, সে কী কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে। কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার কেমন ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না। পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে লোভ হয়, কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চুচালনা করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো-একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেই রকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয়, কিন্তু পাত্রটা তফাত। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজতথালের উপর উদ্‌ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন ক'রেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে আসতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কী আছে শৃগাল তা ভালো করে চক্ষেও দেখতে পায় না— দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্য ইংরাজসমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত, কিন্তু আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই-চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারি নে। সর্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক বা না হোক, এখানকার

লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু ব'লে, হাঁ ক'রে রাস্তায় ঘাটে পর্যটন ক'রে, থিয়েটার দেখে, দোকান ঘুরে, কল-কারখানার তথ্য নির্ণয় ক'রে— এমন-কি, সুন্দর মুখ দেখে আমার শ্রান্তি বোধ হয়েছে। কেবলমাত্র গতি, কোলাহল, সমারোহ— অবস্থাবিশেষে ভালো লাগতে পারে। যদি কখনো জীবন মনের নিতান্ত জড়ভাব উপস্থিত হয় তখন তাকে বাহিরের অবিশ্রাম আঘাতে সচেতন ক'রে ঈষৎ জীবনের উত্তাপ দান করতে পারা যায়। কিন্তু মন যখন সদা-সচেতনভাবে কাজ করছে, চিন্তা করছে, ভালোবাসছে, তখন বাহিরের এই বিপরীত গোলযোগে তাকে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। বলা আবশ্যক, এই-যে গোলযোগ এ কেবল আমাদেরই পক্ষে গোলযোগ, সেখানকার নেটিভদের পক্ষে নয়। সমুদ্রের যে গর্জন সে কেবল সমুদ্রতীরেই শোনা যায়, জলজন্তুরা বেশ নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন নির্বাহ করে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।

৭ অক্টোবর। 'টেম্‌স্‌' জাহাজে একটা ক্যাবিন স্থির করে আসা গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান এবং আর-এক জনের জিনিসপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস'। বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাবলুম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা এবং শুকনো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের

সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে! যাদের মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ট নয়, এইটুকু ক্যাবিনের মধ্যে তাদের দুজনের স্থান সংকুলান হবে কী করে? গালে হাত দিয়ে বসে এই কথা ভাবছি এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে 'শুভ প্রভাত' অভিবাদন করলেন— মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করছেন। এঁর শরীরে ইংলন্‌ড্‌বাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্যতীর এবং ভেণ্ট্‌নর শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখব তার যো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরাজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকে। কিন্তু, এমন সর্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলাতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর তাদের বড়ো মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই এক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েছে আর-এক সময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয়—ওটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভালো। যতক্ষণ দূরে আছি কোনো বালাই নেই, কিন্তু লক্ষপথে প্রবেশ

করলেই ইংরাজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ ক'রে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার, হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন— তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্য কারও সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে— কিন্তু একটি মুগ্ধহৃদয়ের কথা বলতে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সংগীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্বে যে ইংরাজি সংগীতকে পরিহাস করে আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্বেকার কোন্-এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোনো কোনো পুরুষ যাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন— তার মধ্যে একটা হচ্ছে চৌকিতে পিন ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হল না এবং সেই-সকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখা যাচ্ছে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন, তাতে ততটা সামাজিক নিন্দার কারণ হয় না। ভেবে দেখতে গেলে

ইংরাজ-সমাজেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ আছে ব'লেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয়, স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেই রকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময় সেটা ভালোবাসে। পুরুষদের মুখের উপর রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীক্ষ্ণ তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে আপনার গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্য কারণ -বশতঃ নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন ব'লেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে আনন্দ লাভ করেন। কার্যক্ষেত্রে যারা পরস্পর সমকক্ষ প্রতিযোগী, সামাজিক আচারে ব্যবহারে তাদের মধ্যে সমান ভাবের ভদ্রতার নিয়ম থাকা আবশ্যক ; কিন্তু যেখানে সেই প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। এবং বলোন্মত্ত পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। স্ত্রীলোকের যে বল সে এক হিসাবে পুরুষেরই প্রদত্ত বল —মাধুর্যের কাছে আমরা স্বাধীনভাবে আপন স্বাধীনতা বিসর্জন করি। অবলার দুর্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বলপ্রাপ্ত হয়েছে এই জন্য যে, পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে এবং এই সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই কোনো বিষয়েই স্ত্রীলোকের কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না— তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষপূজাকে, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই, স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম ব'লে প্রচার করে। সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্ছে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন ক'রে

পিছনে চলেছে; স্বামীর দল ফার্স্ট্ ক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়সড় ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে; সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট এবং উদ্‌বর্ত কেবল স্ত্রীলোকের— এবং তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ইতস্ততঃ হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না— তারা কেবল এইটুকু মাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন যুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতো দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম ক'রে খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে, কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসংকোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা পুরুষমানুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে, এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে থাকে: যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস থাকলে অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রাল্টার পৌঁছনো গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফ -ওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকীস্বরে বললেন— পাখাওয়ালারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে তার একমাত্র প্রতিবিধান হচ্ছে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চলতে লাগল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশি দুর্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের একটা লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি! শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথাও বহু চেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না! বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরাজি ভাষাটা বড়োই বিজাতীয় রকমের ভাষা— মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা আর কিছুতেই মনের মতো কায়দা করে উঠতে

পারি নে— তখন মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাকনাড়া মৌমাছির মতো মুখদ্বারে ভিড় করে ছুটে আসে। ভাবলুম এত উতলা হয়ে উঠলে চলবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো-চারটে ব্যাকরণ-শুদ্ধ ইংরিজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভালো হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমত ভাবটা ইংরাজিতে রচনা করতে লাগলুম।—

'কথাটা ঠিক বটে মশায়! পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুললে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃস্টীয় সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।'

'যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, খপ করে তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা— অভদ্রতার চেয়ে বেশি!

'আমরা [illegible]টা যে তোমাদের চেয়ে দুর্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য, সে আর আমাদের অস্বীকার করবার যো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি, তোমরা ভারী পালোয়ান।

'কিন্তু সেইটেই কি এত গর্বের বিষয় যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হয়!

'তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই?

'থাকতেও পারে। তবে, যখন একজন অস্থিজর্জর অর্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে ঠাহর করা যায় না।

'বেচারার অপরাধ কী দেখা যাক! ভোরের বেলা আহার করে বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আরো দুটো পয়সা বেশি উপার্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু-চার আনায় বিক্রয় করেছে। নিতান্ত গরিব ব'লেই তার এই ব্যবসায়, বড়োসাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করে নি।

'এই ব্যক্তি রাত্রে' পাখা টানতে টানতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে —এ দোষটা তার আছে বলতেই হবে।

'কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

'এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে। কারণ, তখনি তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়— সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু মাত্র প্রভেদ।

'তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে থাক যে, তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।

'কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে, যে জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে 'তেরিয়া'— অর্থাৎ তোমরা যাকে বল 'বুলি'— যার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই— অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে, কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোনো বিদেশীরাজ্য-শাসনের যোগ্য নয়।

'অবশ্য, যোগ্যতা দু রকমের আছে— ধর্মতঃ এবং কার্যতঃ। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্বক চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিক গুণের দ্বারাই সে কার্য-বহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

'তুমি কেবল প্রহারের জোরে পিতার কর্তব্যসাধন করতে পার, কিন্তু পিতৃস্নেহ এবং মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতীত ধর্মতঃ পিতৃত্বের অধিকার জন্মে না।

'কিন্তু ধর্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না ব'লে যে ধর্মের রাজ্য অরাজক তা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে, এক সময় এরা তোমাদেরই শিরে ভেঙে পড়বে।

'যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব -সহকারে সহ্য করে যাই, প্রতিকারের কোনো ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

'কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য অনেক ইংলন্‌ড্‌বাসী ইংরাজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একটা জাতই স্বতন্ত্র : কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়, যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে— সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

'কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে ;

যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না। যে সৌভাগ্যবানের দ্বারে অর্গল আছে, চোরের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের প্রতি তার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না— অর্গলটাই তার আশু উপকারে দেখে।

'লাথির পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্মভয় দেখানো যদিচ দেখতে অতি মনোহর হয় বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে মাত্র বলসঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোনো।

'শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরাজ প্রভুর নিতান্ত 'পেটার্নাল ট্রীট্‌মেন্ট্'টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজের পিলে কিরকম অবস্থায় আছে এ পর্যন্ত কার্যতঃ তার কোনো পরীক্ষাই হয় নি।

'আমাদের ভারতবর্ষীয়দের বিশ্বাস, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকেরই পিলে এত অতিশয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যে, বুট-সমেত সজোর লাথি বেশ নিরাপদে সহ্য করতে পারে।

'কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্ছে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যে রকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই এক রকম করে বলা হয় যে, তোমাদের আমরা মানুষ জ্ঞান করি না— তোমাদের দুটো-চারটে যে খামকা আমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে তোমাদের পিলের দোষ! পিলে যদি ঠিক

থাকত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাকতে, এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।

'যা হোক, ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে, দুর্বল হলেও, তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না ক'রে থাকা যায় না।

'কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে। ইংলন্ডে তো তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন, তাঁরা সভাসমিতি ক'রে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরাজের ঘর থেকে কি একটি মেয়েও আসেন না যিনি উক্ত বাহুল্য করুণ-রসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। তিনি তো আমাদের মুরুব্বি ছিলেন না, যথার্থই পিতা ছিলেন। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, সুযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথন-কালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কী অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেন নি!' --

যাই হোক, স্বগত উক্তি যত ভালোই হোক স্টেজ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া, যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ-ওয়ালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এ দিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠল চোর তখন পালিয়েছে

— তারা পূর্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েছে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগছে ভালো। অল্প বয়স, মন খুলে কথা কয়, কারও সঙ্গে বড়ো মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট ক'রে ব'নে গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন— তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলে : They are not at all smart। বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরাজ মেয়ে দেখা যায়, তারা বড়োই smart— বড্ড চোখমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখা-চোখা জবাব— কারও কারও লাগে ভালো, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোটো ছোটো নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে, তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেক দিন ইংরাজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে

আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়— সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মল্টা দ্বীপে পৌঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন শহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে, তারই সোপান বেয়ে শহরের মধ্যে উঠলুম। অনেকগুলি গাইড-পান্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বললেন— 'চাই নে তোমাকে' – 'একটি পয়সাও দেব না'— তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বললেন লোকটা গবিব সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো ইংরাজ হলে এমন করত না। আসলে, মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জনা করতে পারে, কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যে এক-জাতীয়ের পক্ষে আর-এক-জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, একজন ইংরাজ ভিক্ষুক এবং একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুক ঠিক এক শ্রেণীর নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির অগৌরব না থাকাতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা অবলম্বন করে তার আত্মসম্মান দূর হয় না। আমাদের দেশে মানুষের দয়া এবং দানের উপর মানুষের অধিকার আছে; দাতা এবং ভিক্ষুক, গৃহস্থ এবং অতিথির মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধবন্ধন নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিক্ষার মধ্যে সেই হীনতা নেই। আমাদের মহাদেব ভিখারী। ইংলন্‌ডে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর-কিছুর উপরে নির্ভর করা হীনতা, সুতরাং ইংরাজ 'বেগর' ঘৃণার পাত্র।

ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত ইতিহাস-পরম্পরা যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি তা হলেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!

'মল্টা' শহরটা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় শহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠছে, একবার নীচে নামছে। সমস্তই দুর্গন্ধ, ঘেঁষাঘেঁষি, অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য। আহারান্তে, শহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যান্‌ড্‌বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লন্‌ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার

তত দোষ ছিল না— আমাদেরই দোষ। আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি বিষয়বুদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না। এরকম মুখশ্রী দেখলে অতি বড়ো সৎ লোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক, মল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনার-টেবিলে 'স্মাগ্লিং' সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেণ্ট্‌কে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা যেন কিঞ্চিৎ গৌরবের বিষয় মনে করে। আর যাই হোক, তেমন নিন্দা বা লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এমনি জীব! একজন ব্যারিস্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পূরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সেজন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফি'র দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরাজি করে বলেন 'রাইটিয়াস ইন্‌ডিগ্‌নেশন'। সর্বনাশ!

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। এই বৃষ্টিতে এক দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্‌প্‌ বেয়ালা ম্যান্‌ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোনো গেল। শহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুই ধারে নালায়

মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চ'ড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা খাবে কি ? আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ-শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে ? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইশারায় তামাক প্রার্থনা ক'রে বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানি নে— আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গী-দ্বারা ভাবপ্রকাশ চলতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো বাড়ি, জানলার কাছে ফিগ-ফল শুকোতে দিয়েছে। এক-এক জায়গায় ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রগতিতে এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের দেখলুম। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোটো ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দা দিয়ে, ছবি দিয়ে, রঙিন জিনিস দিয়ে, নানা রকমে সাজানো ; যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর— এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষি আছে— মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্ছে না।

গোরস্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খল ভাবে স্তূপাকারে সাজানো। তৈমুরলঙ বিশ্ববিজয় ক'রে একদিন এই রকম একটা উৎকট কৌতুকদৃশ্য দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে-একটা কঙ্কাল চলে বেড়াচ্ছে ঐ মুণ্ডগুলো

দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে— কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তা হলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে ব'সে ব'সে শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে। পুরোনো বিষয়। পুরোনো কথা। ঐ নরকপাল অবলম্বন করে নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন— কিন্তু অনেক ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে আমার কিছুই ভয় হল না। শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা দুরাশা অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর, ঐ গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদগুলোর, মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে চীৎকার করে মরছে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নিচ্ছে না।

যাই হোক, আপাততঃ আমার এই কপালফলকটার মধ্যে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করছে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ-নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে— ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেছে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। এক রকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্র-তপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী পৃথিবীর-অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে— এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে— সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম দু ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর— জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বালুকারাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে— কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানা-টানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস --কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার— যৌবন-কালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো এ নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, তবু কোনো যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার

চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে-একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই। আমি এর ইতিহাস জানি নে— কিন্তু যে-সব রমণী চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে উগ্র উত্তেজনায় জীবনের সমস্ত সহজ সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীতত়ৃষ্ণ হয়েছে তাদের বয়স্ক অবস্থা কী শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না— তারা অল্পে অল্পে অতি সহজে স্ত্রী থেকে মা, এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে। পূর্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।

ও দিকে আবার মিস অমুক এবং অমুককে দেখো। কুমারীদ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কী খেলাই খেলাচ্ছে। আর কোনো কাজ নেই, আর কোনো ভাবনা নেই, আর কোনো সুখ নেই— সচেতন পুত্তলিকা— মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চোখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর।

২৫ অক্টোবর। আজ সকাল বেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন্‌বুল অম্লানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি; কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় ব'লে মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম নম্রতা গুণটা খুব ভালো হতে পারে, কিন্তু খৃস্টজন্মের ঊনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা

ভীরুতার মতো। নাওয়ার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয়, কিন্তু প্রাতঃকালেই এতটা মাংসবহুল কপিশ-বর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সংকোচ-জনক মনে হল। স্বার্থপরতা অনেক সময় এই জন্যই জয়লাভ করে— বলিষ্ঠ ব'লে নয়, অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিত ব'লে।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক।

সকালে ডেক ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুই ধারে ডেক-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালি-পায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধুসঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে। ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়! তিনটি মাত্র স্নানাগার; আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা -সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘন ঘন টুপি উদ্‌ঘাটন করে মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন -পূর্বক গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নটার ঘণ্টা বাজল। ব্রেক্‌ফাস্ট্ প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারি-সারি শূন্য-হৃদয় চৌকি ঊর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল, এবং তার দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধানিবৃত্তি করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতি-উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেছে তার ঠিক নেই।

তার পর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে, টেনেটুনে, পাশ কাটিয়ে, পথ ক'রে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

তার পরে দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করছে, কিম্বা কোনো বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না— তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকি।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায়। ধূম্রসেবীগণ, হয় ধূম্রকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ-বা নবেল পড়ছে, কেউ-বা শেলাই করছে; মাঝে মাঝে দুই-

একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে গুন্‌গুন্‌ করে আবার চলে যাচ্ছে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে ক্বয়ট্‌স্‌ খেলা আরম্ভ হল। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই যুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কলসীর বিড়ের মতো কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে উর্ধ্বকণ্ঠে চীৎকার করে উঠছেন। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ বা গণনা করছে, কেউ বা খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আসছে। কেবল দুই-একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন, কিম্বা ড্রাফ্‌ট্‌ খেলছে, এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্বয়ট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে, এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটি মাখন মিষ্টান্ন -সহযোগে চা-রস পান করে শরীরের জড়তা পরিহার -পূর্বক পুনর্বার ডেকে উপস্থিত।

পুনর্বার যুগল মূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না— দিবা-বসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে।

দক্ষিণে জ্বলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েছে। জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব ভারত-বর্ষের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজল। বেশ পরিবর্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারি সারি নরনারী বসে গেছে। কারো-বা কালো কাপড়, কারো রঙিন কাপড়, কারো-বা শুভ্রবক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলছে। গুন্‌গুন্‌ আলাপের সঙ্গে কাঁটা-চামচের টুংটাং ঠুং ঠুং শব্দ উঠছে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মতো যাতায়াত করছে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতলবায়ুসেবন। কোথাও বা যুবক যুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করছে, কোথাও বা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো যুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্ছে

একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা এক ধারে পাঁচ-সাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্মচারী জটলা করে উচ্চহাস্যে প্রমোদ-কল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষরা কেউ বা ব'সে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্ছে, কেউ বা স্মোকিং সেলুনে কেউ বা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলছে। ও দিকে সংগীতশালায় সংগীতপ্রিয় দু-চার জনের সমাবেশ হয়ে গানবাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্ছে।

ক্রমে সাড়ে-দশটা বাজে— মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারি দিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মতো ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েছে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁকছে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গীদ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। যতই পরিপূর্ণ করে টিফিন এবং লেবুর শরবৎ খাচ্ছে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছনো গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতী পোশাক

এবং চালচলন ধরেছে। বলে ইন্‌ডিয়া লাইক করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুশকিলে পড়েছে— কখনই বা পড়বে, কখনই বা জবাব দেবে! লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়োই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে কোনো 'ফন' নেই! উপরন্তু কেবল ল্যাঠা! এমন-কি শত শত জর্মান ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে 'ফ্লার্ট্' করে এসেছে কিন্তু তাতে কোনো মজা পায় নি! একটা মেয়েকে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা যায়, সে আদর করে পাখার বাড়ি মারে, এই তো ফ্লার্টেশন— এতে 'ফন' নেই! লোকটা পৃথিবীতে কিছুতেই যথেষ্ট মজা পাচ্ছে না, কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য লোকে যে মজা উপভোগ করছে তা বোধ হয় সে স্বপ্নেও জানে না।

২ নভেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস ব'চ্ছে— সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেছে; কেউ ক্বয়ট্‌স্ খেলছে, কেউ নবেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে; ম্যুজিক সেলুনে গান চলছে, স্মোকিং সেলুনে তাস চলছে, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্ছে, এবং একটি সংকীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরছে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নভেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নভেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোনো মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল— টাকাকড়ি-সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!— আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক চোট ভর্ৎসনা করেছি— সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতা-মুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

—

প রি শি ষ্ট

সবুজ সমুদ্র, নীল তীর, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ভারতবর্ষের প্রতি একান্ত আকর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন বাহু বাড়িয়ে রয়েছে। জীবনের যত সুখ যত ভালোবাসা ঐখেনেই। বেচারা দরিদ্র অক্ষম স্নেহময় ভারতবর্ষ। ক্রমে সন্ধ্যা। ক্রমে তীর তিরোহিত। Lighthouse— সাগরে ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার জাগ্রত দৃষ্টি। মনে হল মিথ্যা সভ্যতা, মিথ্যা জীবনসংগ্রাম— মিথ্যা য়ুরোপীয় উন্নতিচক্রের আকর্ষণ— নিষ্ফল দুরাশা— বাংলার এক প্রান্তে ভালোবাসার একটু সুরক্ষিত নীড়, এই আমাদের ঢের। এই মহা প্রবহমাণ মানবস্রোতের মধ্যে আমাদের পড়বার কী দরকার ছিল! আমরা চতুর্দিকে মানসিক বেড়া দিয়ে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে বেশ আরামে গুছিয়ে বসেছিলুম। কোন্ ছিদ্র দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত এসে পড়ে আমাদের সমস্ত ছারখার [করে] গুলিয়ে দিয়ে গেল! আজ আমাদের এই মৃদু ক্ষীণ প্রাণের মধ্যে এত দুরাশার আক্ষেপ কেন এনে দিলে? কেন দুরাশা ঐ য়ুরোপীয় বহ্নিশিখার প্রতি আমাদের আকর্ষণ করছে? আমাদের মাথার উপরে হিমালয় এবং পদতলে সমুদ্রবাধা আরও দুর্গম হল না কেন? বেশ অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে একদল মানুষ আটকে থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে বদ্ধ হয়ে, একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর একটি হ্রদ যেমন নিস্তরঙ্গভাবে চিরদিন কেবল আকাশের প্রভাত-সন্ধ্যার ছায়া আপনার মধ্যে অঙ্কিত করে।

২২ অগস্ট্। শুক্রবার। ১৮৯০। শ্যাম। মঙ্গলবার পর্যন্ত একটা দিন বলে ধরা যেতে পারে। Seasickness। রাত্তিরে পরের ক্যাবিনে ঢুকে পরের কম্বল অপহরণ। স্বপ্ন। লোকেনের প্রতি মানসিক অসদ্ভাব।— মঙ্গলবারে ডেকে উঠে লোকেনের প্রতি

অসাধারণ আসক্তি। বুধবারে প্রশান্ত সমুদ্র, উজ্জ্বল সূর্যালোক, কবিত্ব চিন্তা ও তজ্জাতীয় কথোপকথন। বৃহস্পতিবারে চমৎকার দিন— চিঠি লেখা। রাত্রে চন্দ্রালোকে একটা দেড়টা পর্যন্ত আলোচনা। ঘন বৃষ্টি। তার পরদিন সমস্ত দিন বৃষ্টি। সল্লিকে চিঠি। অতি ধীর গতি। দুই-একটা পাহাড়-পর্বতের রেখা। চমৎকার সন্ধ্যা। চন্দ্রালোকে এডেন। হঠাৎ জাহাজ-বদল। দীর্ঘ জাহাজ, সহস্র আলোকচক্ষু। জিনিসপত্র গোলমাল। দুই দল দুই দিকে। মার্সেলিয়া জাহাজ। নতুন লোকজন।

পুরোনো জাহাজের সহযাত্রী— মাতৃহীন কতকগুলি মেয়ের একটি রুগ্ন বাপ— বেচারা! একটি চিরহাস্যময় বালক civilian। Gambling।— নতুন জাহাজের সর্বোচ্চ ছাত। অনেক রাত্রে ছাড়লে। শান্ত সমুদ্র, জ্যোৎস্না রাত, বেশ বাতাস। ডেকে নিদ্রা। নতুন লোক। একটি মেয়ের প্রতি বহু পুরুষের দৃষ্টি। অনেক ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। আজ শনিবার [৩০ অগস্ট্]। ব্যান্ড্ বেশ লাগছে। সল্লি ও কুমুদের চিঠি— বেশ রৌদ্র— সবসুদ্ধ বেশ। লোকেন নীরব। দূর সমুদ্রতীরের আরবদেশের পাহাড়-গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত ও ঝাপসা দেখাচ্ছে — যেন তন্দ্রার ছায়া পড়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

আমি লোকটা স্বভাবতঃ একটু চুপচাপ এবং একটু কোণ ভালোবাসি। দুই-একজন যাদের ভালোবাসি তাদের কাছের গোড়ায় নিয়ে বেশ একটুখানি সন্ধ্যালোক এবং একটু মধুর চিন্তার মধ্যে থাকা আমার জীবনের একমাত্র সাধ। দুশ্চিন্তা, দুশ্চেষ্টা, প্রবল কর্মপ্রখর আমোদ —আমার নয়। কিন্তু আমি কাউকে পাই নে। কারও চুপ করে বসে থাকবার সময় নেই, পৃথিবীতে আমি এবং

সন্ধ্যা এবং আকাশ এবং সৌন্দর্য ছাড়া আরও ঢের জিনিস আছে, কত কর্তব্য কত উদ্দেশ্য আছে, পৃথিবী খুব বেগে চলছে। কাজেই আমাকে কেবল একলা বসে থাকতে হয়। তাও পেরে উঠি নে— কাজেই যারা উদ্দাম বেগে কর্তব্যের দিকে এবং আমোদের দিকে যাচ্ছে তাদের সঙ্গ রাখবার জন্যে আমার চিন্তা ফেলে, সন্ধ্যা ফেলে, তাড়াতাড়ি ছুটতে হয়। সুতরাং আমার ভাবটা না তাদের মতো, না আমার মতো ; না খাটতে পারি হাসতে পারি, না ভাবতে পারি উপভোগ করতে পারি— না আমি পৃথিবীর সেবক, না আমি পৃথিবীর নবাব।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়, ভারী প্রাচীন, ভারী শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রাচীনত্ব অনুভব করি— বিশ্রাম এবং চিন্তা এবং বৈরাগ্য। আমাদের যেন এখন ছুটির সময়। যা উপার্জন করা গেছে তারই উপরে নিশ্চিন্তে শেষ বেলাটা কাটাবার সময়। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে— যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নতুন রাজার রাজত্বে ক্রোক হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যে রকম খাটছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতকে নতুন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে। চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো— কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো— পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব মানব -রাজার রাজস্ব দেও। উঠেছি তো, চলেওছি— দেখাচ্ছি খুব কাজের লোক হয়েছি— কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা নিরাশ্বাস কতটা নিরুদ্যম। থেকে থেকে মনে হয় আমরা কাজের লোকের সঙ্গে কিছুতেই তাল রেখে চলতে পারব না, অথচ আমাদের বিশ্রাম এবং শান্তির অবসর রইল না। হায়, ভারতবর্ষের

বেড়া ভেঙে মনুষ্যস্রোত কেন আমাদের মধ্যে এসে পড়ল! কেন আমাদের লজ্জা দিচ্ছে, কেন আমাদের দায়ে ফেলে নিষ্ফল কাজে লাগাচ্ছে— পুরাতন বনেদী বংশের দারিদ্র্য কেন পৃথিবীর সামনে প্রচার করছে! তবে ওঠো— political agitation করো— joint stock company খোলো— শিথিল মাংসপেশী নিয়ে মাঞ্চেস্টরের সহস্র লৌহবাহুর সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করো— দেখো কী হয়। কিন্তু আমি যুবা বটে, তোমাদের বয়সী বটে, তবু সভায় যাই নে, চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরি নে, খবরের কাগজে লিখি নে— আমি নিতান্ত জীর্ণ ভারতবর্ষীয়— আমি ভাবি, কী হবে! শেষ রক্ষা করবে কে!

অথচ ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে, বিচিত্র কল্লোল, প্রবল গতি, মহান্ বেগ, অবিশ্রাম কর্ম, তখন আমার মন নেচে ওঠে— তখন ইচ্ছা করে সহস্র বৎসরের গৃহপ্রাচীর ভেঙে ফেলে বেরিয়ে পড়ি। আবার তখনি মনে হয়, যখন পিছিয়ে পড়ব তখন ফিরব কোথায়! যখন সবাই ফেলে যাবে তখন দাঁড়াব কোথায়! তার চেয়ে পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাস ভালো, এই ক্ষুদ্র সুখ এবং অগাধ শান্তি ভালো। তখন মনে হয়— আমরা কিছু অসভ্য বর্বর নই; আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় খবর বের করতে পারি নে, কিন্তু খুব ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে দেখা যাক পৃথিবীর এই নতুন সভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা দেখে আমাদের ভালোবাসবে, কবে আমাদের দুর্বলতা দেখে অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের নূতন উন্নতি, যৌবনের বলাভিমান এবং জ্ঞানাভিমান কালক্রমে নরম হয়ে আসবে এবং আমাদের স্নেহশীলতা দেখে আমাদের প্রতি স্নেহ করবে— দুর্বল

হয়েও, অনেকগুলো বিষয়ে নূতন সংবাদ না রেখেও, আমাদের কেবল কোমল হৃদয়টুকু নিয়ে মানবপরিবারের মধ্যে স্থান পাব। গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা দেখে আপাতত সে দিন কল্পনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আচ্ছা, নাহয় তাই হল, আমরা নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, Timesএর স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল— আপনা-আপনি ভালোবেসেই কি যথেষ্ট সুখ পাব না?

নিদেন আমি তো আপনাকে তাই বোঝাচ্ছি। তোমরা কাজ করছ বোধ হয় ভালোই করছ— আমি পারি নে, আমার বিশ্বাস এবং উৎসাহ জাগে না, আমি কাছাকাছির মধ্যে ভালোবেসে যতটা পারি সুখে থাকি এবং যতটা পারি সুখে রাখি।

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, ক্ষমতার অত্যাচার আছে, অসহায়ের অপমান আছে, কোণে বসে ভালোবেসে তার কী করবে! হায়, ভারতবর্ষের সেই তো দুঃসহ কষ্ট! আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব! রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা ক'রে? দরখাস্ত ক'রে? আজ একটু ভিক্ষে নিয়ে, কাল একটা লাঠি খেয়ে? তা কখনোই হবে না। প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল— যখন এই অসীম শক্তিকে একবার সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি— তখন কি আর আশা হয়? তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি, প্রবল হতে না পারি তবু ভালো হবার চেষ্টা করি এবং ভালোবাসি।

আমি যখন Matthew Arnoldএর কবিতা পড়ি তখন মনে হয় য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যতটুকু প্রাচীন হয়ে পড়েছে তারই যেন

আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ এই অবিশ্রাম কর্ম এবং জীবন-সংগ্রামের মধ্যে একটা শ্রান্তি এবং সন্দেহ এসে ক্ষীণ স্বরে বলছে, ওগো, একটু রোসো, একটু থামো— এসব কী হচ্ছে একটু ভাবো, একটু ভাবতে সময় দাও। মানুষ কেবল হাঁস্‌ফাস্‌ করে খাটবার জন্যে হয় নি, মাঝে মাঝে চুপচাপ করে ভাবা আবশ্যক। যখনি একটা জাত আপনার কাজের হিসেব নিতে যায়, যখনি সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে 'এতদিন যা করলে তার থেকে অবশেষে হল কী', তখনি বোঝা যায় তার পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। যখন মানুষ কেবল কাজের প্রবাহে প্রাণের উৎসাহে আপনি কাজ করে যায় তখনি তার বল। য়ুরোপে এখন সকল বিষয়েরই নিকেশের খাতা বেরিয়েছে। ধর্ম বলো, মানবহৃদয়ের সহস্র উচ্চ-আশা মহৎ-প্রবৃত্তি বলো, সকলেরই খানাতল্লাসি চলছে। একটা বড়ো বিশ্বাসের জায়গায় ছোটো ছোটো সহস্র মত বাসা করছে। যেমন একটা বৃহৎ প্রাণীর মৃতদেহে সহস্র ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মগ্রহণ করে— কিন্তু সেটা জীর্ণতারই লক্ষণ।

এমন নয় যে আমাদের কিছুই নেই, আমরা একেবারে বর্বর জাতি। এমন নয় যে বেদুয়িনদের মতো আমাদের মাথার উপরে কেবল শূন্য আকাশ এবং পায়ের নীচে উদাস মরুভূমি। আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি— এত প্রাচীন যে এর ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, মানুষের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে— সেই জন্যে ভ্রম হচ্ছে এ নগর যেন মানব-ইতিহাসের অতীত, যেন প্রাচীন প্রকৃতির এক রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে লিখে রেখেছে— সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্ন রেখে গেছে এবং সহস্র বসন্ত এর প্রত্যেক

ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ চিরহরিৎ অঙ্কে অঙ্কিত করে গেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এর মধ্যে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে— এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটিল শাখাপ্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে সহস্র সহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে ছায়াময়ী বলে ভ্রম হয়— এখানকার এই প্রাচীন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে এবং বয়স্ক লোকেরা স্বপ্ন দেখে, প্রখর সূর্যালোক ছিদ্রপথে সেখানে প্রবেশ করে ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়। প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখাপথের জটিলতার মধ্যে প্রতিহত হয়ে সেখানে এসে মৃদু মর্মরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এখানে জীবনমৃত্যু সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন মিলিয়ে এসেছে— অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা এক সঙ্গে চলেছে। এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার জায়গা! এখানকার জীর্ণ ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের শৃঙ্খলিত অগ্নিগর্ভ দুরন্ত লৌহদৈত্যদের কারাগার -নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের প্রবল উদ্যমের বেগে এর শিথিল ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করতে পারো বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন শ্রান্ত জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি— সেই এদের মহৎ গর্ব যে প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি; কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য অনেক বংশবৃদ্ধি

অনেক নূতন সুবিধে-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে, নূতনকে এবং পুরাতনকে, সুবিধেকে এবং অসুবিধেকে সেই পিতামহপ্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে; সামান্য অসুবিধের খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে নূতন গৃহবৃদ্ধি বা পুরাতন গৃহসংস্কার করে নি; যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র হয়েছে সেখানে বটের শাখা, অথবা কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে ছায়া দান করেছে। এই মহা নগরারণ্য ভেঙে গেলে একটি বৃহৎ প্রাচীন শ্রান্ত জাতি একেবারে গৃহহীন— কেবল তাই নয়— একটি সহস্র বৎসরের প্রেতাত্মা এখানে যে চিরনিভৃত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেও নিরাশ্রয় — তার আর-কোনো ইতিহাস নেই, তার জন্মমৃত্যুর তারিখ নেই, সে কেবল এই প্রাচীন অধিবাসীদের ভগ্ন গৃহের মধ্যে বহুকাল আপন প্রাণহীন প্রাণ বহন করে আসছে। তোমরা হঠাৎ এসে বলছ— ওঠো, তোমরা জেগে ওঠো— এ-সমস্ত ভেঙেচুরে বদলে ফেলো— ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে— এখন কর্মের যুগ পড়েছে, অমূলক চিন্তার সময় নেই। আমরা ভীত হয়ে তোমাদের বলছি এবং আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি— ঠিক কথা— মানবের উন্নতি-সাধনের জন্যে কর্ম আবশ্যক, কিন্তু এমন কর্মস্থান আর কোথায় আছে! দেখো, এইখানেই মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে আর্য-বর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে— এইখানে কত রাজ্যপত্তন কত নীতিধর্মের অভ্যুদয় কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে, এই-সমস্ত ভগ্নস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান করলে তার সহস্র চিহ্ন পাওয়া যাবে। অতএব আমাদের সমস্ত প্রস্তুত আছে, কিছুই করবার আবশ্যক নেই। তোমরা শুনে হাসছ, মনে করছ অনেক দিন নিদ্রামগ্ন থেকে 'ছিল' এবং 'আছে'র মধ্যেকার প্রভেদ আমরা ভুলে গেছি— মধ্যে স্বহস্তে কিছু পরিবর্তন করি নি ব'লেই মনে করছি যা

ছিল ঠিক তাই আছে। মনে করছ, এ একটা আলস্যের নির্‌বুদ্ধিতা-মাত্র। কিন্তু আমরা মুখে যাই বলি আমাদের আসল কথাটা বুঝে দেখো। আসল কথাটা হচ্ছে, আমরা কাজ করতে পারব না, কিন্তু তা বলে আমাদের অধিক লজ্জার বিষয় নেই— কেননা, আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি, আজকাল আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমরা মানবসভ্যতার খানিকটা ভিত্তি গেঁথে বিশ্রাম করতে বসেছি— এখন তোমাদের পালা, তোমরা কাজ করো। অবিশ্বাস কর যদি, অকর্মণ্য বলে যদি লজ্জা দাও, তবে আমরা বলব— তোমাদের ঐ তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদাল দিয়ে ভারতভূমি থেকে যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির মৃত্তিকাস্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের হস্তচিহ্ন আছে কি না। তোমরা যে নতুন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তার শেষ হয় নি, এখনো তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয় নি। মানব-অদৃষ্টের যা চিরন্তন সমস্যা এখনো তার কোনোটার মীমাংসা হয় নি। তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে বর্তমান সভ্যতাকে পরম জটিল করে প্রচণ্ড জীবিকাসংগ্রাম বাধিয়ে দিয়েছ, এর শেষ ফল কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা যে অহর্নিশি নূতন নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, স্বাস্থ্যজনক গৃহের বিশ্রাম থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকে সমস্ত জীবনের কর্তা করে প্রবল উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, এমন-কি স্ত্রীলোকদেরও গৃহকর্ম থেকে বের করে হয় আমোদের মত্ততা নয় জীবনের রণক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছ, তোমরা

কি জেনেছ তোমরা কী করছ? তোমরা কি জানো তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমরা জানি আমরা কোথায় এসেছি, আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকট-কর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী-দরিদ্রে, দূর ও নিকট -সম্পর্কীয়ে, আত্মীয় অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি; যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে কাটিয়ে দিচ্ছে— কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না। এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না। এই সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতবর্ষ জীবনের এই এক মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে সুখের যথার্থ উপায় সন্তোষ— এবং সমস্ত সমাজ-নীতির দ্বারা ভারতের গৃহে গৃহে ও অন্তরে অন্তরে সেই সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। যেটা খুঁজেছে সেটা পেয়েছে এবং সেটা দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তার আর-কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উপপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমরা যখন একদিন কাজ বন্ধ করবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে? আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন অবশেষে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে অলক্ষ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অবগাহন করে, সেই রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় ক'রে এঞ্জিন যে রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই

বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ থেমে যায়, সেই রকম প্রবলবেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি লাভ করবে? যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ। অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি —এই কথাই ভালো।

কিন্তু গৃহরক্ষা হয় কী করে! যদি বাইরের কোনো উৎপাত না থাকত তা হলে তো কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু অজানা অচেনা লোক আমাদের এই নিভৃত নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে; আমাদের ইটগুলি খুলে, আমাদের গাছগুলো কেটে, তারা আপনাদের ঘর বানাতে চায়; বহু যত্নে আমাদের ছেলেদের মুখে যে অন্নের গ্রাসটি তুলে দিচ্ছি পরের ছেলের [জোয়ান গোঁয়ার] বাপগুলি এসে তা কেড়ে নিচ্ছে। এখন বিশ্রাম থাকে কোথায়? প্রাচীন হও আর শ্রান্ত হও আর নিজের প্রতি যে রকম স্তোক-বাক্যই প্রয়োগ করো, আর প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেকে যতই সম্মান ও সমাদর করো, আহার তো চাই, অপমান এবং দারিদ্র্য থেকে সন্তানদের রক্ষা করা তো চাই, যখন চার দিকে অসংযত বলের খেলা এবং নিষ্ঠুর জীবিকাসংগ্রাম তখন আত্ম-রক্ষার জন্যে সক্ষমতা লাভ করা তো চাই। এ কথা তো বললে চলবে না— 'আমরা প্রাচীন হয়েছি অতএব মরণ হলে দুঃখ নেই'।

আরও একটা কথা। সুখ বলে একটা জিনিস কিছুই নেই— সুখটিকে একটি দুর্লভ রত্নের মতো সংগ্রহ করে একটি কৌটোর মধ্যে পুরে ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে কেউ বলতে পারে না 'বাস্ হয়ে গেল— আমার আর কিছু করবার নেই'। বিচিত্র মানবপ্রবৃত্তির চর্চাই সুখ। জীবনের প্রবাহই সুখ। অভাব যত অধিক, জীবিকা-সংগ্রাম যত দুরূহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তির

আলোড়ন ততই বেশি। সন্তোষ আর সুখ এক নয় সে কথা আমরাও জানি। আমরা যখন বলি সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো তখনই স্বীকার করি সুখ ও সন্তোষ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সুখের চেয়ে সন্তোষ আমরা প্রার্থনীয় মনে করি। কেননা দুর্বলের জন্য সুখ নয়— সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্‌সিজেন যেমন প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেই রকম আমাদের দাহ করে। যৌবনে এই দাহ যে রকম প্রবল বার্ধক্যে সে রকম নয়— কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধেরা বলতে পারে না যে, তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন এবং সন্তোষই যথার্থ সুখ। এই পর্যন্ত বলতে পারে 'আমার পক্ষে আবশ্যক নেই'। অতএব, কোণে বসে য়ুরোপের সুখ য়ুরোপের প্রাণ অস্বীকার করবার কারণ দেখা যায় না।

কেবল বিচার্য বিষয় এই, এর একটা সীমা আছে কি না। যতই প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষার বিকাশ বাড়ছে ততই তার কিয়ৎ-পরিমাণ চরিতার্থতাও একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠছে কি না। ততই জীবনের সফলতা -লাভের জন্যে গুরুতর ক্ষমতার আবশ্যক হচ্ছে কি না এবং সে ক্ষমতা স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্পতর ও সুযোগ্যতর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হচ্ছে কি না। এই রকমে উত্তরোত্তর দুঃখী লোকের সংখ্যা বাড়ছে কি না। সমাজে সুখবিভাগের যত বৈষম্য হয় ততই তার পক্ষে বিপদ কি না। ভারতবর্ষে যেমন জ্ঞানসম্পদ কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল ব'লে জ্ঞানের অনেক বিভাগের আরম্ভ মাত্র হয়েছিল কিন্তু পরিণতি হয় নি, চতুর্দিক্‌বর্তী বিপুল ভ্রান্ত সংস্কারের স্রোত এসে তাকে প্লাবিত করে দিয়েছিল, তেমনি সৌভাগ্য যদি সমাজের এক অংশের মধ্যেই বদ্ধ হতে থাকে তা হলে ক্রমে দারিদ্র্যদুঃখের সংঘর্ষে তা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কি না।

দ্বিতীয় কথা— fittestরাই survive করে, কিন্তু fitness অনেক রকমের আছে। কেউ বা কঠিন ব'লে বাঁচে, কেউ বা কোমল ব'লে বাঁচে। কেউ বা উন্নত হয়ে বাঁচে, কেউ বা নত হয়ে বাঁচে। গাছ এক রকম করে বাঁচে, লতা আর-এক রকম করে বাঁচে। আমরা যে মনে করছি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচব, বাস্তবিক আমাদের সে যোগ্যতা আছে কি? জাতির মধ্যে কি বৈচিত্র্য নেই? সকলেরই কি টেঁকবার এক রকম উপায়? খুব সম্ভবতঃ সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা ছাড়া আমাদের আর বাঁচবার কোনো উপায় নেই। অতএব আমরা যে য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি সে কি বাঁচবার পথে যাচ্ছি না মরবার পথে যাচ্ছি? আমরা যদি আমাদের স্বাভাবিক মৃদু কোমলতা রক্ষা করি তা হলেই কি প্রবলের কঠিনতা সহজে সহ্য করতে পারব না? আমরা যদি কঠিন হই তা হলেই কি কঠিনতরের আঘাতে ভেঙে যাব না? কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা। স্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরাজশিক্ষা যখন স্বভাবতই আমাদের একমাত্র প্রধান শিক্ষা হচ্ছে, দুর্বলের প্রতিও যখন জীবনের প্রবলতার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে, তখন বিজ্ঞ বিবেচনার কথা বলা বাহুল্য— এবং কে জানে সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কি না এবং কে জানে ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন এবং বহির্ঘটনা পরস্পরে মিলে আপনাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপন করবে কি না।

শনিবারটা [৩০ অগস্ট] চলছে। খানিকটা ভাবছি খানিকটা লিখছি— খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি— খানিকটা Band শোনা যাচ্ছে— মাঝে মাঝে জাহাজ, মাঝে মাঝে পাহাড় অনুর্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনহীন, মাঝে মাঝে তীরশূন্য সমুদ্র—

এইরকম করে সূর্যাস্তের সময় হল। Band বাজছে। Castle of Indolence যদি কোথাও থাকে তো সে হচ্ছে জাহাজ— বিশেষতঃ গরম দিনে প্রশান্ত Red Seaর উপরে— ইংরেজ-তনয়রাও সমস্ত দিন ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে দিবাস্বপ্ন দেখছে— কেবল জাহাজ চলছে, এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া খেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণস্বরে পাশ কাটিয়ে একটুখানি সরে যাচ্ছে— আর বিকেলের দিকে বাতাসও একটু একটু বইতে আরম্ভ করেছে— জগতের আর-সমস্ত স্বপ্ন দেখছে— দুই-একটা শাদা লঘু মেঘখণ্ড তারাও নড়ছে না।--

সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের এবং জলের চমৎকার রঙ হয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি নিটোল সুডোল কোমল পরিপূর্ণ যৌবনের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় এসেছে যার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই, যা অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সন্ধের সময় চিল আকাশের যে-একটা সর্বোচ্চ নীলিমার সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত পাখা সমতল রেখায় বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেই রকম একটা চরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার রঙ হয়েছে তাকে আকাশের ছায়া বললে যেন ঠিক বলা হয় না— যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ধ্যাকাশের স্পর্শ লাভ করে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকার গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়েছে— সে কতটা তার কতটা আকাশের বলা যায় না। আমাদের কত কবিতা কত গান আর-এক জনের দুখানি নেত্রের

ছায়া— এও সেই রকম। সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আশ্চর্য রঙ দেখে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা কোথায়? আবার তখনি মনে হল দরকার কী? আমার মধ্যে এ চঞ্চলতা কেন? এই সমুদ্রের এবং আকাশেরই মতো আমার মনের সমুদয় চেষ্টা নির্বাণ লাভ করে না কেন? হৃদয়ের সমুদয় তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়ে থাকি নে? এই বৃহৎকে ছোটোর মধ্যে বেঁধে আপন আয়ত্তের মধ্যে পেতে চাই কেন? সবই ধরতে হবে, রাখতে হবে— এই কেবল চেষ্টা! অনেক সময় এই রকম দুশ্চেষ্টার বশে, যতটুকু পাওয়া যেতে পারে তাও ভালো করে পাবার সময় থাকে না।

কিন্তু মনে হয় সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকু যদি পারিজাতপুষ্পের মতো তুলে নিয়ে কারও হাতে না দিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্যে। ঠিক এই উজ্জ্বল ম্লান নিভৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক মর্মস্থলে যদি আমরা দুজনে দাঁড়াতে পারি তা হলে আমরা যেন আপনাদের আরও বেশি বুঝতে পারি, আরও বেশি ভালোবাসি। কারণ, ভালোবাসা বোঝাতে গেলে সৌন্দর্যের ভাষা চাই এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতা চাই। এমন আলোক, এমন বর্ণ, এমন ভাষা আমরা নিজের মধ্যে কোথায় পাব! এই বৃহৎ প্রকৃতি যখন তার একটা চরম মুহূর্তে আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত ক'রে বলে তখন আমাদের আর-কোনো চেষ্টার আবশ্যক করে না— কেবল ভালো-বাসবার পূর্ণ অবসর পাওয়া যায়, ভালোবাসা প্রকাশ করবার আবশ্যকটুকুও থাকে না। এ কথা হয়তো সকলে বুঝতে পারবে

না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্যি যে, ঐ আকাশ আমারই অসীম দৃষ্টির মতো এবং এই সমুদ্র আমারই ভালোবাসামুগ্ধ হৃদয়ের মতো — এই মুহূর্তে এই সমুদ্রে আমার আপনাকে ব্যক্ত করবার জন্যে একটি কথা বলবার আবশ্যক থাকত না। যদি এর অনুরূপ একটি কথা থাকত তা হলে সেইটি লিখে নিয়ে যেতুম, যে শুনত সে সমস্ত বুঝতে পারত। থাক্‌গে— কবিত্ব থাক্‌। রাত্তিরে ডিনার-টেবিলে Inspector-General of Policeএর সঙ্গে লোকেনের তর্ক, আরও দুই-একজন যোগ দিয়েছিল।

রবিবার [৩১ অগস্ট্‌]। সকালে Evansএর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের বিষয় এবং ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল, তাতে সে কতকটা আশ্বাস দিলে— কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়। আজ সকালে এখানে উপাসনা হল। একটা মেয়ে ভারী বিরক্ত করেছিল— একে তো সে যোগ দেয় নি, তার পরে হো হো করে হাসছিল— এমন খারাপ লাগছিল! যখন উপাসকরা সবাই মিলে গান গাচ্ছিল আমার বেশ লাগছিল। এর মধ্যে সমস্ত মানবের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়, চির-অজ্ঞাত চিররহস্যের দিকে ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের কী-একটা বিশ্বাসের গান উঠছে! আশ্চর্য! ঐ মেয়েটা মাঝে মাঝে যখন সেই গানে যোগ দিচ্ছিল তখন আমার নিতান্ত blasphemous বলে ঠেকছিল, তার অট্টহাস্যও তত খারাপ ঠেকে নি। বিশ্বাস না থাকলে কি হৃদয়ও থাকতে নেই? আজ breakfastএর সময় একটা খবরের সৃষ্টি করা গেল। রুটি কাটতে গিয়ে ছুরিটা ছিটকে সবলে আমার দুটো আঙুলের উপর পড়ল, রক্ত ছিটকে উঠে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল— খানিকটা বরফ দিয়ে ন্যাপ্‌কিনে আঙুল জড়িয়ে ক্যাবিনে ছুট। গা বমি করতে লাগল। অনেক

ক্ষণ বাদে ডাক্তারের ঘরে গেলুম, সে আমার হাত বেঁধে দিলে— দিতে দিতে মাথা ঘুরে এল, অন্ধকার দেখতে লাগলুম, কানে শুনতে পেলুম না— এমনি লজ্জা করতে লাগল! অনর্থক অনেক রক্তব্যয় করেছি— না দেশের জন্যে, না ধর্মের জন্যে, না স্বার্থের জন্যে। সমস্ত দিন কিছু-না-কিছু লিখেছি। আমরা এদের সকলকে দূরে পরিহার করে যে রকম একটা কোণ ঘেঁষে আছি তাতে বেশ বোঝা যায় এরা একটু piqued হয়, আমার সেটা মন্দ লাগে না। ভাবে এরা কজন বিদ্রোহী নব্যবঙ্গবাসী।

এমন মধুর ক'রে তুমি ভাবিতে পারো না মোরে—
এমন স্বপন এমন বেদন এমন সুখের ঘোরে।
এমন বাতাস জলের বিলাস এমন আকাশ -মাঝে,
শুনিতে পাও না কেমন করিয়া উদাস বাঁশরী বাজে!
এমন অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
সারাদিন ধ'রে জলেতে আলোতে এমন অলস খেলা!
জীবনতরণী ভাসিয়া চলেছে মরণ-অকূল-বাগে,
দিবসে নিশীথে সুদূর হইতে তোমার বাতাস লাগে।
এমনি করিয়া ধীরে মিশাব সুদূর নীরে,
যেমন করিয়া সন্ধ্যানীরদ মিশায় নিশীথতীরে।
তখন বারেক চাহিয়া দেখিয়ো করুণ নয়ন তুলি—
বিদায়ের পথ আঁধারে ঢাকিবে, তার পরে যেয়ো ভুলি।
সন্ধ্যা আসিবে যবে তোমার মধুর ভবে
দিবসের শেষে শ্রান্ত হইবে জীবনের কলরবে—
তখন বারেক আসিয়ো আবার দাঁড়াইয়ো ঐখানে,
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখো ঐ অস্ত-অচল-পানে

যেখানেতে শেষ দেখা   রাখিয়া গিয়াছে রেখা
জ্যোতির্ময় এক অমর অশ্রু তারা-আলোকেতে লেখা—
বাকি আর-সব স্তব্ধ নীবব তিমিরনিরাশ নিশি,
অজানা অপার অকূল আঁধার প্রসারিয়া দশদিশি।

cancelled . .

সোমবার [১ সেপ্‌টেম্বর]। সকালবেলাটা শরীর ভালো ছিল না, চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছি। তুই-একজন লোক আপনি আলাপ করে গেল। এরা কাল থেকে জানতে পেরেছে আমরা Tagores, তাই কাল থেকে কাছাকাছি ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে। [কাল] একটা কবিতা লেখবার চেষ্টা করা গেছে, সেটাতে মনের ভাব ভালো ব্যক্ত হয় নি। বদলাতে হবে। টিফিনের পর সেলূনে বসে বাবিকে চিঠি লিখতে বসেছি— তরঙ্গ উঠে আমাকে এবং আমার চিঠিগুলোকে ভিজিয়ে দিলে, তাতে তুই-একজন এসে আহা-উহু করে গেল। সন্ধের পর আহারান্তে চুপচাপ করে ডেকের উপর জমিয়েছি, লোকেন একটা চৌকির উপরে অগাধ নিদ্রামগ্ন, মেজদাদা চুরট টানছেন— এমন সময়ে নিচেকার ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল— সকলে মিলে নাচের ধুম পড়ে গেল। মহা-ঘুর্‌পাক মহা-উত্তেজনা চলছে— তখন পূর্বদিকে নবকৃষ্ণপক্ষের ঈষৎ ভাঙা চাঁদ ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করেছে— এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে চাঁদের পাণ্ডুর আলোক পড়ে সে দিকটা ভারী একটা অসীম ঔদাস্য এবং নৈরাশ্যের ভাবে পূর্ণ দেখাচ্ছিল। চাঁদের উদয়পথের নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত একটা প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে— এই বিজন সমুদ্রের মাঝখানে প্রকৃতি চুপিচুপি আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সমস্তই ধীরে নীরবে সুন্দর

হয়ে উঠছে, রাত্রির সুমধুর শান্তি একটি রজনীগন্ধা-কুঁড়ির শুভ্র পাপড়ির মতো অলক্ষিত নিঃশব্দে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে— আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো ঘুর্‌পাক খাচ্ছে— ভারী আমোদ করছে— সর্বাঙ্গের রক্ত গরম হয়ে মাথায় ফেনিয়ে উঠছে, বিশ্বসংসার সমস্ত ঘুরছে, হাঁপাচ্ছে, তপ্ত হয়ে উঠছে— আশ্চর্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে অনন্তকালের চির-পুরাতন গাথা সমস্বরে গান করছে— এই রজনীতে এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত-অপরিচিত লোক জুড়ি-জুড়ি জড়াজড়ি করে লাঠিমের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুর খাওয়াকে খুব সুখ মনে করছে— একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমি এটা কিছুতেই ভালো বুঝতে পারি নে। যাক্‌গে, মরুক্‌গে, যাদের ঘুরুনি পায় ঘুরুক্‌গে— আমার যা আছে তাই আমার থাক্‌। আমার এই চন্দ্রালোককে নিয়ে কোনো ইংরেজের ছেলে polka নাচতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক ভয় হয়, পাছে সর্বজয়ী ইংরেজ-তনয় আমার জীবনের কোনো-একটি অচল শান্তিসুখকে টেনে নিয়ে এমনি করে polka নাচায়।

মঙ্গলবার [২ সেপ্‌টেম্বর]। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় Evansএর সঙ্গে আমার বেশ দীর্ঘ আলাপ হয়, বেশ লাগে। আজ সকালে দেখলুম সে একটা নিতান্ত বেচারা ইংরেজ-বাচ্ছার কাছে modern thoughts and modern scienceএর কথা পেড়েছে, সে ব্যক্তি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে খানিকটা ইতস্তত করে দে-ছুট দিলে। Evans হতাশ্বাস হয়ে চৌকিতে বসে পড়ল। আমি তার কাছে একটা কথা পাড়লুম। আমি বললুম আমি Ib en-

এর নাটক পড়ছিলুম, তাতে একটা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম— যত-সব স্ত্রীলোকেরাই সমাজবিপ্লবের জন্যে ব্যাকুল এবং পুরুষেরাই সমাজের প্রাচীন সংস্কারসকলের উপর আকৃষ্ট হয়ে আছে। বরাবর জানি মেয়েরাই সমাজের বন্ধন। আমার বোধ হয় বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা এমন আকার ধারণ করেছে যাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অসুখী হয়ে আছে। জীবিকাসংগ্রাম এতদূর প্রবল হয়েছে যে, সমস্ত শক্তি তাতেই প্রয়োগ করতে হচ্ছে, গৃহের জন্যে অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে— লোকেরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, পুরুষেরা বিয়ে করতে চাচ্ছে না—এ রকম স্থলে স্ত্রীলোকের অবস্থা সেই অনুসারে পরিবর্তিত না হলে তারা সুখী হতে পারে না। এই জন্যে য়ুরোপীয় মেয়েদের মধ্যে একটা বিপ্লবের ভাব দেখা দিয়েছে। নিহিলিস্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মেয়ে আছে, তারা পুরুষের চেয়ে প্রচণ্ড। ক্রমে ভারতবর্ষের কথা উঠল। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই জাত। জন-সংখ্যাবৃদ্ধিবশতঃ বেহার প্রভৃতি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ -আশঙ্কা। কুলি-চালান নিয়ে বাংলা কাগজের পাগলামি। Elective Principle। আমি বললুম আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা আমাদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অবজ্ঞা কর, তোমরা আমাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার কর না ব'লেই আজকাল এই-সব গোলমাল উঠেছে— আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও সদয় ব্যবহার, পেতুম তা হলে আমরা বেশ সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করতুম— But the very small courtesy with which you nationally treat us hurts our selfrespect and we try to make up for it by striving to get a larger share in the adminis-tration, and by making ourselves thoroughly ob-noxious to you। আমি বললুম, অ্যাংলোইন্‌ডীয় সমাজে তোমরা

সচরাচর এমনভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা কও যে, আমাদের প্রতি রূঢ় হওয়া তোমাদের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত হয়ে যায়। Evans এ কথা খুব মেনে নিলে। সে বললে, এখন যে-সব সিভিলিয়ান আসে তাদের অধিকাংশের কোনো বংশমর্যাদা নেই, তারা ভদ্রতা কাকে বলে একেবারে জানে না ইত্যাদি। আজ সমস্ত দিন প্রায় চিঠি লিখতে গেল।

বুধবার [৩ সেপ্‌টেম্বর]। আবার Evansএর সঙ্গে পূর্বোক্ত বিষয়ে কথাবার্তা। Lord Riponএর policyর নিন্দা, Lord Dufferinএর প্রশংসা, ডফারিন সম্বন্ধে আমাদের পেট্রিয়ট্‌দের ব্যবহার নিতান্ত নির্বোধ ও আত্মঘাতী। দশটার সময় সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ থামল। চমৎকার রঙের খেলা— কত রকম নীল এবং কত রকম হলদে – পাহাড়ের উপর রৌদ্রছায়া এবং নীলবাষ্প, বালির তীররেখা ঘন হলদে, ঘন নীল সমুদ্রের ধারে চমৎকার দেখাচ্ছে। খালের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন জাহাজ অতি ধীর গতিতে চলছে, দু ধারে তরুহীন বালি— কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো ছোটো কোটা বহুযত্নবর্ধিত গাছপালায় বেষ্টিত হয়ে বড়ো আরামজনক দেখাচ্ছে। আজও সমস্ত দিন চিঠি লেখা। অনেক রাত্তিরে অর্ধচন্দ্র উঠল— চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট, ধূধূ করছে— কাল অনেক রাত জেগেছি— কেবল বাড়ির জন্যে প্রাণ টানে— আমার মতো গৃহপোষ্য জীব পাওয়া যায় না। রাত ২।৩টের সময় পোর্ট্ সৈয়েদে পৌঁছনো গেল— সেখানে কয়লা তোলার ধুম। বিশেষ দ্রষ্টব্য শহর নয়।

বৃহস্পতিবার [৪ সেপ্‌টেম্বর]। Mediterranean। এই আসলে য়ুরোপে পড়লুম। ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সমস্ত দিন Spectator প্রভৃতি কাগজ পড়েই কেটে গেল। Mediterranean চমৎকার নীল।

শুক্রবার [৫ সেপ্‌টেম্বর]। দিনটা লিখতে লিখতেই কেটে গেল। আজ আর ডেকে শোওয়া হল না। ঠাণ্ডা পড়ে আসছে। ক্যাবিনে শয়ন। আজ জাহাজের ডেকে stage বেঁধে একটা entertainment হবে তার উদ্যোগ। Baldwinএর দল অভিনয় করবে। প্রথমে amateurদের কাণ্ড, কারও বা পিয়ানো টিং টিং, কারও বা ক্ষীণ কণ্ঠে গান। তার পরে Mrs Baldwin প্রথমে পুরুষ masher সেজে তার পরে midshipmanএর বেশ ধ'রে বেশ comic গান গেয়েছিল এবং বেশ নেচেছিল। তার পরে ব্যালে নাচ, নিগ্রোর গান, জাদু, একটা ছোটো প্রহসন প্রভৃতি বহুবিধ কাণ্ড হয়েছিল। মাঝে Sailors' Homeএর জন্যে চাঁদা-আদায়ও হল। সকলে খুব আমোদ পেয়েছিল। আজ বিকেলে Crete দ্বীপের তীরপর্বত দেখা দিয়েছিল।

শনিবার [৬ সেপ্‌টেম্বর]। আজ ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খেয়ে অবধি বাড়িতে চিঠি লিখছি। শুনলুম ইতিমধ্যে একটা জলস্তম্ভ দেখা দিয়েছিল। গ্রীসের তীর আমাদের দক্ষিণে দেখা দিয়েছে। লোকেনের টানাটানিতে একবার চিঠি রেখে উঠে গিয়ে দেখে এলুম। এই সেই গ্রীস!— লিখতে লিখতে এক সময়ে বাঁয়ে চেয়ে দেখি Ionian Islands দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাদা বাড়ি— আরও একটু এসে পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ধারে একটি বড়ো শহর, মানুষের শ্বেত মৌচাক— সন্ধান করে জানলুম দ্বীপের নাম Zanthe, শহরের নামও তাই। উপরে গিয়ে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি— আকাশে মেঘ করে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের দোতালা ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেললে। পর্বতের উপর ঘন মেঘ নেবে এসেছে— কেবল দূরে

একটা পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক পড়েছে, আর সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটু প্রবল বাতাস এবং খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল— তাতেই কেটে গেল আর ঝড় এল না। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অনেক সময়ে অনিশ্চিত। আমরা যেখান দিয়ে এলুম এ জায়গা দিয়ে সচরাচর জাহাজ আসে না। জায়গাটা নাকি ভারী ঝোড়ো। রাত্তিরে ডিনারে Woodroff কাপ্তেনের Health-প্রস্তাব ও সকলে মিলে তার গুণগান করলে। আজ রাত্তিরে জিনিসপত্র বাঁধতে হবে, কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব।

রবিবার [৭ সেপ্‌টেম্বর]। সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। লাগেজ-তদারক এক বিষম ল্যাঠা। এক প্রকাণ্ড omnibus— দুটি রোগা ঘোড়া। লোকে ও মালে পরিপূর্ণ। আস্তে আস্তে চলল। রাস্তা পাথরে বাঁধানো। এক জায়গায় লোকে পরিপূর্ণ— আজ হাট— ব্যান্‌ড বাজছে— খুব যেন একটা-কিছু ধুমধামের ব্যাপার আছে। বিবিধ রকমের ফলের ঝুড়ি— সারি সারি জুতো সাজানো দেখলুম। স্টেশনে এসে লোকেন আমাদের চিঠিগুলো এবং তার মাশুল একজন লোকের হাতে দিলে — কিন্তু সে ব্যক্তি যে রীতিমত মাশুল লাগিয়ে পোস্ট্‌ করবে আমার বিশ্বাস হল না। অবশেষে একটা গাড়ি নিয়ে আবার বেরোলুম। ডাকঘরে চিঠি দিয়ে বাঁচলুম। জ্যোৎস্নাকে meet করবার জন্যে সতুকে একটা এবং তারকবাবুকে একটা পৌঁছসংবাদ টেলিগ্রাফ করা গেল। দুই-এক থোলো আঙুর পথ থেকে কিনে আবার স্টেশনে ফিরলুম। এখন তো পুল্‌মান গাড়িতে চড়েছি। একটা মস্ত গাড়ি— ডাইনে বাঁয়ে সারি-সারি কতকগুলো মক্‌মল-মোড়া জোড়া জোড়া মুখোমুখী ছোটো seats— মাথার উপরে শোবার বন্দোবস্ত লট্‌কানো, বোধ হয় রাত্তিরে টেনে দিয়ে বিছানা করে দেবে। গাড়িতেই খাবার সেলুন। একটা মস্ত

নাবার ঘর আছে বোধ হয়— এত লোকে মিলে হাত মুখ ধোওয়া নাওয়া নিয়ে বোধ হয় কিঞ্চিৎ গোল বাধবে। যা হোক, ট্রেনে চড়ে বসে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে। মেঘ করে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। আহার করে এলুম। প্রথমে দুই দিকে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে olive-বাগান। বামে দূরে পর্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, মধ্যে কেবল অলিভ-বন। বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত গাছ— পাতাগুলো যেন ঊর্ধ্বমুখ— খুব যত্নে যেন চাষ করা— আমাদের দেশের মতো জঙ্গল নয়— ফাঁক ফাঁক পোঁতা— পাহাড়ে জায়গা— চষা জমির মধ্যে পাথরের কুচি— এক-এক জায়গায় গাছতলায় ভেড়া চরছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে এক-একটি ছোটো শহর আসছে— চর্চচূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্ধবে নগরটি সমুদ্রের নীল চিত্র-পটের উপর চমৎকার দেখাচ্ছে। (ব্রিন্দিসিতে নাববার সময় Evans আমাকে দেখালে ইটালীয় পুলিসম্যানেরা সৈনিকবেশে তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। বললে, এর থেকে বোঝো এখানকার গবর্মেণ্ট্ কিরকম ; এদের অনেক রকমের institutions আছে, কিন্তু freedom নেই। আমরা সাড়ে-এগারোটার সময় ব্রিন্দিসি ছাড়ি।) এক-একটা অলিভ গাছ এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে করে তাকে ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে। শীত তেমন বেশি নয়। আমাদের পৌষের চেয়ে কম বোধ হয়, তবে শীত গ্রীষ্ম সম্বন্ধে তুলনা ভারী শক্ত। প্রায়ই একটা-না-একটি সমুদ্রতীরের শহর। ঐ সামনের শহরটা মস্ত মনে হচ্ছে।— দু ধারে কেবল ফলের বন এবং আঙুরের ক্ষেত— মাঝে মাঝে এক-একটা পাথরের বাড়ি। ছোটোখাটো শহর, শাদা সোজা রাস্তা। ক্ষেতগুলো পাথরের টুকরো উঁচু উঁচু ক'রে বেড়া-দেওয়া। এখনো ডাইনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে— বামের পর্বত গেছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাথর উঁচু

করে গোলাঘরের মতো করে রেখেছে বোধ হল। মাঝে মাঝে কূপ, চক্রযন্ত্রে জল তোলে। থোলো থোলো বেগুনি আঙুর ফলে রয়েছে। সমুদ্র আর দেখতে পাচ্ছি নে, ডাইনে বাঁয়ে তরুহীন অপার সমতল চষা মাঠ। ডাইনে খুব দূরদিগন্তে পাহাড়ের নীল রেখা। অবিচ্ছিন্ন অলিভের বন আঙুরের ক্ষেত আর দেখছি নে — চষা মাটি, এক-এক জায়গায় ঘাস। দূরে দূরে মাঠের মধ্যে মধ্যে এক-একটা শাদা বাড়ি। আবার আঙুর এবং অলিভ— বামে ঈষদ্‌দূরে এক শহর। এক-এক জায়গায় ভুট্টার চাষ। সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দু ধারে চষা মাঠ, সমভূমি, শূন্য— দক্ষিণ বাম দিগন্তে দুই পর্বতশ্রেণী।

আমাদের দু ধারে জমি উঁচুনিচু তরঙ্গিত হয়ে এসেছে। দূরে একটা নীল হ্রদ দেখা যাচ্ছে, তার এক ধারে একটি ছোটো শহর। আমি বসে বসে যে আঙুর খাচ্ছি তার গন্ধ অনেকটা গোলাব-জামের মতো। আঙুরের থোলো কী চমৎকার দেখতে। রেলোয়ে স্টেশনে একটি ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হল ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙুরের মতো নিটোল সুগোল টস্‌টসে, যৌবনের রসে যেন পরিপূর্ণ এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রঙ— খুব বেশি শাদা নয়। একটি মেয়ে দেখলুম প্রায় আমাদেরই মতো কালো, কিন্তু দেখতে মিষ্টি, এখানকার বেগনি আঙুরের মতো। আবার সমুদ্র দেখা দিয়েছে— বোধ হয় যাকে হ্রদ মনে করেছিলুম তা হ্রদ নয়, সমুদ্রের একটা বাহু। তীবে বালির উপর অযত্নজাত গুল্ম উঠে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের ঠিক নীচেই সমুদ্র— আমরা তার একটা উঁচু তটের উপর দিয়ে চলেছি। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা রয়েছে, ভাঙা জমি ঢালু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে প্রবেশ করেছে— সে জমিটুকু চাষ-করা— দুটো

ছেলে খেলা করছে। নিচেকার তীরপথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। এক-একটা গাধার উপর দুটো লোক। আমাদের বাঁ দিকে পাহাড়। সূর্য অস্ত গেছে। এখনো সমুদ্রতীরে কতকগুলো গোরু চরছে; কী খাচ্ছে তারাই জানে, মাঝে মাঝে শুক্‌নো খড়কের মতো দেখা যাচ্ছে মাত্র— একটা বাছুর রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। এখানকার সমুদ্র তেমন নীল দেখাচ্ছে না, মেটে রকমের। ঢেউগুলো ফেনিয়ে ফেনিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে।

রাত্রে টঙের উপর চড়ে তো বেশ নিদ্রা দেওয়া গেল। আজ সোমবার [৮ সেপ্‌টেম্বর]। সকালে উঠে দেখা গেল চার দিকে সুন্দর শ্যামল— পরিপাটি রকম চাষ-করা ভুট্টার ক্ষেত— প্রত্যেকের ক্ষেত বড়ো অলিভ গাছ দিয়ে ঘেরা, তাই পাশাপাশি দুই ক্ষেতের মাঝখানের ব্যবধানটুকু বেশ সুন্দর ছায়াপথের মতো দেখাচ্ছে। কোথাও তিলমাত্র জঙ্গল নেই। কাল যে রকম আঙুরের ক্ষেত দেখেছিলুম আজ সে রকম দেখছি নে। সে আঙুরগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো— আজ দেখছি লম্বা লম্বা এক-একটা কাঠি পোঁতা, তার উপরে আঙুর লতিয়ে উঠেছে। উঁচুনিচু জায়গা, ছোটো ছোটো ভুট্টার ক্ষেত, তার চার দিকে আঙুরের বেড়া— এবং এক-এক জায়গা কেবলই আঙুর। মাঝে মাঝে দুটো-একটা বাড়ি, এক-আধটা চার্চ্‌, বেশ দেখাচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে একটি শহর। তুঁতের ক্ষেত। ছোটো ছোটো চতুষ্কোণ তৃণক্ষেত্র এবং তাকে বেষ্টন করে বেঁটে বেঁটে পল্লবিত তুঁত গাছের শ্রেণী। কোথাও ভুট্টাক্ষেতে তুঁতের বেড়া। কোথাও তুঁত এবং দ্রাক্ষা এক সার বেঁধে চলেছে। আমরা অ্যাড্রিয়াটিক তীরপ্রদেশ ছাড়িয়ে এখন

লম্বার্ডির মধ্য দিয়ে চলেছি। এখানে রেশম ভুট্টা এবং আঙুরের চাষ। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাশে একটি কুটীর; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইটালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। একটি ছোটো বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রশস্ত-স্কন্ধ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে— কী বল, এবং তার কী বন্ধন! তার থেকে আমাদের বাংলাদেশের নব-দম্পতি মনে পড়ল। মস্ত একটা গ্রাজুয়েট্‌পুঙ্গব এবং ছোট্ট একটি বারো-তেরো বৎসরের নববধূ— দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে ড্যাবাড্যাবা নেত্রে তার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করছে। ট্যুরিন স্টেশনে আসা গেছে। এ দেশে পুলিসম্যানের আচ্ছা সাজ যা হোক! মস্ত চূড়া-ওয়ালা টুপি, অনেক জরিজরাও, মস্ত তলোয়ার— খুব একটা সেনাপতির মতো। আমাদের দেশে এ রকম পাহারা-ওয়ালা থাকলে তাদের চেহারা দেখে আমরা ডরিয়ে ডরিয়ে আরও কাহিল হয়ে যেতুম। চোরে যত চুরি করে এদের কাপড়চোপড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি যায়।— আমাদের বাঁয়ের পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে একটু-একটু বরফের শ্বেত চিহ্ন পড়েছে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, কিন্তু কিছুমাত্র শীত করছে না। (কাল রাত্তিরে আমরা যখন ডিনার খাচ্ছিলুম, এক দল লোক প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখছিল। তার মধ্যে দুটি-একটি বেড়ে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল— তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্ত অনেকটা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রী পুরুষগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি ও রুমাল -আন্দোলন, অনেক চুম্বনসঙ্কেত -প্রেরণ, অনেক তারস্বরে উল্লাসধ্বনি -প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের অভিবাদন করতে

লাগল।) আমাদের দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী। বামে অরণ্য এবং ডাইনে পাহাড়ের তলদেশে শহর ও শস্যক্ষেত্র। কী ঘন ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য ! যেখানে অরণ্যের বিচ্ছেদ সেইখান থেকে অমনি একটা দৃশ্য খুলে যাচ্ছে— শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত। একটা পর্বতশৃঙ্গের উপরে একটা পুরোনো দুর্গ দেখা যাচ্ছে। এবং তলদেশে একটি ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্যপর্বত খুব ঘন হয়ে আসছে। গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এইবার বোধ হয় পর্বতভেদী মণ্ট্‌সেনিস গহ্বর আসবে। আজ রীতিমত পর্বতের জায়গায় এসে পড়েছি। এই অরণ্যপর্বতের মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলো তেমন উদ্ধত শুভ্র পরিপাটি নয়— একটু যেন ম্লান, দরিদ্র, নিভৃত। একটি-আধটি চর্চের চূড়া আছে মাত্র, কিন্তু কারখানার ঊর্ধ্বমুখী ধূমোদ্‌গারী বৃংহিতশুণ্ড নেই। আর-একটা ভাঙা দুর্গ। শাদা উপলপথের মধ্যে দিয়ে একটি ছোটো অগভীর নদীস্রোত চলেছে। ক্রমে একটু একটু করে পাহাড়ের উপর ওঠা যাচ্ছে। সাপের মতো পর্বতপথ এঁকে বেঁকে চলেছে। চষা ক্ষেত ঢালু পাহাড়ের উপর সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। পর্বতস্রোত স্বচ্ছ সলিলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে প্রায়ই একটা একটা রেলোয়ে গহ্বর এসে প্রাণ হাঁপিয়ে দিচ্ছে। মণ্ট্‌সেনিস টানেল এখনি আসবে— বোধ হয় দম আটকে মরব। দু ধারে fir গাছ দেখা দিয়েছে। আমাদের ডান পাশে বালি ও পাথরের শাদা প্রশস্ত জলপথ। তারই এক ধার দিয়ে জল নেবে আসছে— তার পরপারে দীর্ঘ fir গাছের অরণ্য, তারই পর থেকে পর্বত উঠেছে। এইবার টানেলে ঢুকছি। ১ বাজতে ১৮ মিনিট। ১ বেজে দশ মিনিটে বেরোলুম। ফ্রান্‌স্‌। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো

দ্রুত, চটুল, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, হাস্যপ্রিয়, কলভাষী— কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বিমল এবং শিশুস্বভাব। মাশুল নিয়ে বেশি উপদ্রব করলে না। একবার একজন এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করে গেল মাশুল দেবার মতো কিছু আছে কি না। আমরা তামাকের কৌটো দেখালুম, সে চলে গেল। ইটালিয়ান ডাকাতরা এইটুকু তামাকের জন্যে ৫ শিলিং এবং দুটো বাক্স ব্রেকে নিয়ে ৩১ ফ্রাঙ্ক্ নিয়েছে। এ জাতের মধ্যে যে ডাকাতের সংখ্যা বেশি হবে তার আর আশ্চর্য কী! সেই স্রোতটা এখনো আমাদের পাশ দিয়ে ছুটেছে— তার দক্ষিণেই fir-অরণ্য নিয়ে পাহাড় উঠেছে— বেঁকে-চুরে, ফেনিয়ে-ফুলে, নেচে, পাথরগুলোকে ঠেলে, রেলগাড়ির সঙ্গে race দিয়েছে। এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে— তার দু ধারে সারি সারি সরল দীর্ঘ গাছ উঠেছে, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি করে আছে। মাঝে মাঝে লোহার সাঁকো। উপর থেকে ঝর্না নেবে তার সঙ্গে মিশছে। ডান দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পার্বত্যপথ স্রোতের পাশ দিয়ে সমরেখায় এঁকে বেঁকে চলেছে। এতক্ষণ পরে আমাদের নির্ঝরিণী সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। সে আমাদের বাঁ দিক দিয়ে কোন্-এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথ দিয়ে অন্তর্হিত হল। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতের মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন রেখাঙ্কিত পাষাণচূড়া প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেবল মাঝে মাঝে এক-এক জায়গা খানিকটা করে fir-অরণ্যের শ্যামল আবরণ রয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন একটা দৈত্য তার সহস্র নখ দিয়ে ওর শ্যামল ত্বক্ ছিঁড়ে নিয়েছে এবং সহস্র বিদারণরেখা রেখে দিয়ে গেছে। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বাঁ দিকে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে একবার অন্তরালে— যেন ফরাসী ললনার মতো

কৌতুকপ্রিয়া, বিবিধ বিলাসচাতুরী জানে। ঐ দু-তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে সুদূর দক্ষিণে চলে গেল। আবার পর্বতের এক জায়গায় মোড় ফিরে ওর সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে। সেই প্রত্যাশায় রইলুম।— ফ্রান্সের গাড়ি ইটিলির চেয়ে অনেক বেগে চলে— আমার লেখা দায় হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে লিখতে হচ্ছে।

আবার সে বাঁয়ে এসেছে। দক্ষিণে পর্বতগুলো একেবারে হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে ক্ষেতের মধ্যে খড়ের গাদা, পাহাড়ের গায়ে বিরলসন্নিবিষ্ট বাড়ি। স্রোত এখনো বাঁ দিকে চলেছে। সেই অলিভ এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র এবং সুদীর্ঘ poplar-শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানা শাক-সবজি। মনে হয় কেবলই বাগানের শ্রেণী। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপরে মানুষের কত যত্ন ও ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতিও তার প্রচুর প্রতিদান দিচ্ছে। এখানকার লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তার আর কিছু আশ্চর্য নেই। কত যত্নে আপনার দেশকে তারা আপনার করছে, একটি বিঘাও যেন অনাদরে ফেলে রাখে নি। আপন বাসস্থানকে কানন করে তুলেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! আমাদের দেশ অযত্নে অনাদরে পড়ে আছে— কোথাও জঙ্গল হচ্ছে, কোথাও পাষাণস্তূপে কঠিন হয়ে আছে, কত ধনরত্ন গুপ্ত পড়ে রয়েছে। আমাদের কাছে আমাদের দেশের কোনো মূল্য নেই।— চমৎকার ব্যাপার! এ কেবলই বাগান। পর্বতের মধ্যে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপলার-উইলো-বেষ্টিত বাগান— সমস্ত ছবির মতো। এইমাত্র বামে পর্বতের পদতলে এক হ্রদ দেখা গেল। বিস্তীর্ণ,

চলেছে। প্রকৃতি এবং মানুষে মিলে কেবল সাজাচ্ছে এবং উৎপন্ন করছে।— সেই হ্রদ চলেছে। দশ মাইল আয়ত। কিন্তু আর কী লিখব! কত অরণ্য, কত পর্বত, কত নদী, কত শহর।

আমাদের প্যারিসে নাববার কথা হচ্ছে। কিন্তু প্যারিসে আমাদের ট্রেন যায় না, একটু পাশ দিয়ে চলে যায়। যে স্টেশন দিয়ে প্যারিসে যায় সেইখানে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। একবার শোনা যাচ্ছে রাত এগারোটার সময় ট্রেন বদলাতে হবে, একবার শুনছি একটা, একবার দুটো, একবার সাড়ে-তিন, একবার সাড়ে-চারটে। কাপড়-চোপড় প'রেই শুয়ে রইলুম। রাত দুটোর সময় জাগিয়ে দিলে। জিনিস-পত্র বেঁধে উঠে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। দূরে একটা প্ল্যাট্‌ফর্মে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে— কেবল একটি এঞ্জিন, একটি ফাস্ট ক্লাস, এবং একটি ব্রেক-ভ্যান— আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয় চললুম। রাত তিনটের সময় শূন্য প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌঁছনো গেল— সুপ্তোত্থিত দুটো-একটা মশিয়ো আলো নিয়ে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে কাস্টম হৌস এড়িয়ে গাড়িতে উঠলুম। তখন প্যারিস দ্বার রুদ্ধ করে সহস্র দীপ-শ্রেণী জ্বালিয়ে দিয়ে নিদ্রিত। আমরা Hotel Terminusএ হাজির হলুম। liftএ ক'রে চতুর্থ তলায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করা গেল। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বিদ্যুদ্দীপ্ত কার্পেটাবৃত দর্পণশোভিত নীলবর্ণ-যবনিকা-খচিত চিত্রিতভিত্তি নিভৃত কক্ষ, বিহঙ্গপক্ষসুকোমল শয্যা। জিনিস-পত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, একটি পরের overcoat নিয়ে এসেছি। চিন্তা করে দেখা গেল সম্ভবতঃ যার কম্বল আমি রাত্তিরে নিয়েছিলুম তারই overcoat— সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু অ্যাংলোইন্‌ডীয় পুলিশ-অধ্যক্ষ; পুলিশের কাজ করে যদি তার পৃথিবীর উপরে অবিশ্বাস জন্মে থাকে তা হলে

আজ প্রাতঃকালে উঠে আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে তার বড়ো ভালো opinion হবে না। সে এতক্ষণে কত swear কত curse করছে।

মঙ্গলবার [৯ সেপ্‌টেম্বর]। লোকেনের পোর্ট্‌ম্যাণ্টো পাওয়া যাচ্ছে না। ভারী গোল বাধিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস সেটা রেলগাড়ির বেঞ্চির নীচে রয়ে গেছে। সকালে আমরা তিন মূর্তি পদব্রজে বেরোলুম। প্যারিসের কী বর্ণনা করব! প্রকাণ্ড কাণ্ড। রাস্তা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা ইত্যাদি। অনেক ঘুরে ঘুরে এক বইয়ের দোকানে গেলুম। সেখানে গোটাকতক বই কিনে এক খাবারের জায়গায় যাওয়া গেল— সুসজ্জিত চিত্রিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত স্ফটিকখচিত প্রকাণ্ড ঘরের একটি প্রান্তটেবিলে আহারাদি করে এক গাড়ি নিয়ে ইফেল টাউয়ার দেখতে বেরোলুম। এক মস্ত দৈত্য তার সহস্র লৌহ-কঙ্কাল নিয়ে আকাশে মাথা তুলে চার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। liftএ করে প্রথমে আমাদের এক তলায় চড়িয়ে দিলে— চতুর্দিকে প্যারিস উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। ক্রমে আমরা চতুর্থ তলায় উঠলুম, সমস্ত বিরাট প্যারিসের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম— আশ্চর্য ব্যাপার। টাউয়ারে চড়ে বাবি সল্লি আর ছোটোবউকে তিনটে পোস্ট্‌কার্ড্‌ পাঠিয়ে দিলুম। সন্ধের সময় hippodrome দেখতে গেলুম। তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। বাদ্যি বাজছে। প্রকাণ্ড জায়গা। চার দিকে গ্যালারি উঠেছে। রোমান নাট্যশালার মতো মনে হয়। লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। নিদেন দশ হাজার লোক হয়েছিল— তবু এখন season নয়। দুটো মেয়ে tight প'রে barএর উপর যে কাণ্ড করলে সে আশ্চর্য। তার পরে Jeanne d'arc ব'লে একটা pantomime হল। প্রথমে একটা গ্রামের দৃশ্য করেছিল, সেটা বেড়ে লেগেছিল— তার পরে বিদেশী সৈন্য লুটপাট

করতে এল, তার পরে Jeanne দৈববাণী শুনলে, সব-শেষে তার চিতাশয্যা। তার পরে সমস্ত ফ্রান্সের সৈন্য এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মূর্তি-স্বরূপ মেয়েরা ত্রিবর্ণ ফ্ল্যাগ হাতে ঘোড়ায় চড়ে একটা মহা-সমারোহ করে দাঁড়ালো। আগাগোড়া সমস্ত বাজনা এবং গান চলছে। বেশ বুঝতে পারছিলুম ফরাসী দর্শকদের মনটা কিরকম হচ্ছিল।

বুধবার। লন্ডন-অভিমুখে চললুম। Charing Crossএ পৌঁছে দেখি Mrs. Palit ও লিল অপেক্ষা করছেন। জিনিস-পত্র Custom Houseএর মধ্য দিয়ে নিয়ে আসতে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। হোটেলে জায়গা নেই। Mrs. Mullএর ওখানে Mrs. Palit থাকেন, সেইখানে এসে আড্ডা করা গেল। সুবিধেমত জায়গা নয়। Miss Mullকে দেখা গেল। এই সেই বিখ্যাত Miss Mull! সন্ধের সময় লোকেন তার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। বিপদ!

বৃহস্পতিবার। সকালে বেরোনো গেল— এক hansomএ চড়ে প্রথমে সতুকে খুঁজতে বেরোলুম। তাদের বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। কেউ তাদের ঠিকানা জানে না। তার পরে Miss Sharpeএর ওখানে গিয়ে শোনা গেল— তিনি engaged, visitors receive করবেন না। আমরা ম্লানমুখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, তার পরে সৌভাগ্য-ক্রমে আবার ডাক পড়ল। ঢুকে দেখি Miss Sharpe নিতান্ত বৃদ্ধা হয়ে গেছে। engagement কিছুই বিশেষ নেই, একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবা করছেন। জল বায়ু, স্বাস্থ্য, কালের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-চারটে কথা কয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আমার প্রাচীন বন্ধু Scottএর বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা সেখানে নেই, তারা

New Maldinএ গেছে। সেখেনে Gower Street Stationএ এক পাতাল-বাষ্পযান নিয়ে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল—কিন্তু যা চেষ্টা করা যায় তা সব সময়ে সফল হয় না। Hammer-smith স্টেশনে পৌঁছে চৈতন্য হল যে ক্রমেই গম্যস্থান থেকে দূরে যাচ্ছি। একজনকে জিজ্ঞাসা করা গেল; সে বললে, ভুল গাড়িতে উঠেছ, আবার ফিরে যেতে হবে। আবার ফিরলুম। অনেক হাঙ্গাম করে সাড়ে-তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছলুম। তখন এখানকার আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদের জন্যে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু-আধটু এনে দিলে। খেয়ে-দেয়ে আর-এক চোট রাস্তায় বেড়িয়ে আসা গেল। ডিনারের পর Miss Mullএর সহযোগে খানিকটা গানবাজনা হল। Miss Mull মন্দ গায় না।

শুক্রবার। চিঠি লেখবার দিন। চিঠি লিখতে বসলুম। লোকেন ভারী উৎপাত বাধিয়ে দিলে। জোর করে চিঠি সংক্ষেপ করে দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। 'busএ চড়ে প্রথমে Grindlay আফিসে যাওয়া গেল। সেখান থেকে মেজদাদা এক dentistএর দোকানে দাঁত বাঁধাবার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। সেখান থেকে এক প্রকাণ্ড জাঁকালো আহারস্থলে গিয়ে খাওয়া গেল। তার পরে National Galleryতে ছবি দেখতে গেলুম। অনেক ছবি, অল্প সময় দেখে মনে বসে না। এক-একটা খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু সেগুলো হয়তো কোনো যথার্থ চিত্র-সমজ্‌দারের ভালো লাগে না—বোধ হয় অনেক বিখ্যাত ভালো ছবি আমার কিছুই ভালো লাগে নি। 'busএ চড়ে বাড়ি ফেরা গেল। Miss Mull আমার উপর কতকটা অভিমান প্রকাশ করলে। বললে—Mr. T, কেন তুমি সমস্ত দিন বাইরে কাটালে, ঘরে থাকলে আমরা বেশ গানবাজনা নিয়ে

থাকতে পারতুম। আমি বললুম, বেশ, আজ সন্ধের সময় কোথাও বেরোব না। সে বললে, সন্ধের সময় বেশি সময় হাতে থাকে না। যা হোক, সন্ধের সময় আর-একবার গানবাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ piano বাজায়। Miss Mullএ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। সে আমাকে নাচাবার চেষ্টায় ছিল, সেটা আমার পোষালো না। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তা হলে St. James Hall Concertএ গাইতে পারি, আমার রীতিমত উচ্চ-শ্রেণীয় গলা আছে। তা আছে বোধ হয়।

শনিবার। আজ জ্যোৎস্না আসবে। কিন্তু কখন জাহাজ আসবে তার স্থিরতা নেই, তাই docksএ যাওয়া হল না। তাকে সমস্ত directions দিয়ে এক মস্ত চিঠি লিখে দেওয়া গেছে।

বলতে বলতে জ্যোৎস্না উপস্থিত। খুব শক্ত, সমর্থ, সপ্রতিভ। নির্ভয়, নির্লজ্জ, নিরাপদ। যেখানে যা করা উচিত তা ঠিক করেছে। King Companyর উপর লাগেজের ভার দিয়ে special train নিয়ে Liverpool Street Stationএ পৌঁছে underground রেলপথে ঠিক গাড়ি নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে এক hansom ভাড়া করে আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে হাজির। এ ছেলের কোথাও হারাবার আশঙ্কা নেই। চুরি যাবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরে এর ভার দেওয়া নিতান্ত উপহাসের মতো দেখায়। —Coppe পড়া গেল।— একটা ভুলেছি— জ্যোৎস্না আসবার আগে আমরা সকলে মিলে গ্রুপ বেঁধে এক ছবি নিয়েছি। Mr. রাজনারায়ণ ছবি নিলেন। বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়া গেল। Holborn Restaurantএ গিয়ে আহার। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত শ্বেত প্রস্তরের— চার তলা, মস্ত প্রাঙ্গণ, ব্যান্ড্ বাজছে, নিদেন

হাজার লোক খেতে বসে গেছে। সেখেন থেকে Oswaldদের ওখানে যাওয়া গেল। আমাদের ইংরিজি accentএর অনেক তারিফ হল। সেখেন থেকে রাত্রি সাড়ে-এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি তখনো Miss Mull জেগে। তার সঙ্গে একটু-আধটু গল্প হল। কথায় কথায় উঠল তার বোন নেই; সে বললে: I am glad of it. I hate having sisters, brothers are ever so much nicer। এ দেশে বোনে বোনে competition কিনা, উভয়ের মধ্যে বোধ হয় খিটিমিটি চলে। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যদি ভাইবোনদের বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার সম্ভাবনা থাকত তা হলে দুই বোনের চেয়ে ভাইবোনের মধ্যে বেশি ভাব হত।

রবিবার। গান বাজনা। Miss M. একটুখানি flirt করেছিল: Don't you think of me Mr. T. when you sing 'Riez riez' &c.? I *did* laugh when I had my photo taken, didn't I?

তার Shelleyর কবিতা খুব ভালো লাগে ইত্যাদি। অনেক কবিতার কথা পাড়বার উদ্যোগ করেছিল, আমি তাতে বড়ো গা লাগালুম না। আমাকে পীড়াপীড়ি করছে তার confession bookএ লিখতে। তার মধ্যে দেখলুম একজন বাঙালী favourite poetsএর মধ্যে আমার নাম লিখেছে। আমার autograph বাংলা ও ইংরিজিতে লিখে নিয়েছে। সমস্তদিন প্রায় গানবাজনায় কেটেছে।

সোম। সল্লির জন্যে বেহালা কেনা গেল। ভয় হচ্ছে পাছে কাল আমার নামে বাড়ির চিঠি না আসে— তা হলে আমি এ দেশে টিঁকতে পারব না। আজ Savoy Theatreএ *Gondoliers*

দেখবার জন্য টিকিট কেনা গেল। সে চমৎকার কাণ্ড। স্বপ্নের মতো বোধ হল, এমন সুন্দর। এমন সুন্দর নাচ! মনে হল যেন আমার চার দিকে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। Miss Oswald প্রভৃতি আর-এক দল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। supper খেয়ে রাত্তির একটার সময় ফেরা গেল।

মঙ্গল। আজ সকালে উঠে যখন কেবল একখানি ছোটবউয়ের চিঠি পাওয়া গেল তখন মনটা নিতান্ত দমে গেল। আর একদণ্ড এখানে টিঁকতে ইচ্ছে করছিল না। তার পরে যখন breakfast খেতে গেলুম তখন মেজদাদা বাবির একখানি খোলা চিঠি দিলেন। খোলা চিঠির চেয়ে লেফাফাবদ্ধ চিঠি অনেক ভালো লাগে। Miss Mullএর সঙ্গে আমাদের বেশ চলছে যা হোক। সে আমাকে Robin Adair বলে। কাল রাত্তিরে যখন আমি তাকে good night বললুম সে আপনার মনে মনে একটু আস্তে আস্তে বললে : Good night, good night Beloved! সে বলে রবিবারে churchএ যাওয়া সে sinful মনে করে— তার চেয়ে বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করা ঢের উচিত, অধিকাংশ মেয়ে কেবল নতুন কাপড় দেখাতে যায় এবং যন্ত্রের মতো মন্ত্র আউড়ে আসে এবং মনে করে পরিত্রাণের পথ খোলসা হয়ে এল। জ্যোৎস্না এসরাজ বাজিয়েছিল। অনেকগুলো Chopinর বাজনা হল। আমার বাবির বাজনা মনে পড়ে। আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে— কে জানে জীবনটা কেন ভারী শূন্য এবং নিষ্ফল মনে হচ্ছে। আসছে বৎসরে বাবিরা বিলেতে আসবে এই প্রস্তাবটা উত্তরোত্তর পাকা হয়ে আসছে।

বুধবার। দর্‌জির দোকানে গিয়ে দু সুট কাপড় হুকুম করে এলুম। ভয়ানক দাম। ফোটোগ্রাফের দোকানে গেলুম— বাবির

একটা ছবি porcelainএর উপর আঁকাবার ব্যবস্থা করা গেল, ৪ পাউন্‌ড্‌ ৪ শিলিং লাগবে। আমার একটা ছবি নেওয়া গেল। আজ মেঘ করে রয়েছে, সূর্যালোক নেই। কোথাও বেরোতে ইচ্ছে নেই। মেজদা বেরোবার প্রস্তাব করছেন। কী সুখে লন্‌ডনে আছি কে জানে। খুব খরচ হচ্ছে, বাড়ির জন্যে present কেনবার টাকা আর রইল না। মনে করছি কেবল সুরি-বাবির জন্যে কিছু নিয়ে যাব। ধার করতে হবে দেখছি।— 'Niagara Falls' দেখতে গিয়েছিলুম— চমৎকার কাণ্ড। রাত্তিরে গানবাজনা জমাচ্ছিলুম, এমন সময় এক প্রচণ্ড জ্যাঠা ছেলে এসে রাত এগারোটা পর্যন্ত বকাবকি করে গেল।

বৃহস্পতি। আজ সতুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। অনেক রাস্তা ভুলে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে Eastbourne সতুর ওখানে পৌঁছলুম। বেচারা একলা পড়েছে দেখে দুঃখু হল। সেখানে ডিনার খেয়ে রাত্তির সাড়ে দুপুরের সময় বাড়ি ফিরলুম। বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেক ঘুরতে হয়েছিল।

শুক্রবার। সুরিকে চিঠি লিখে দিলুম। confession albumএ লিখলুম। দর্জির দোকানে গেলুম। আজ Scottএর ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল— লোকেন গেল না, তার অন্য স্ত্রীবন্ধুর সঙ্গে engagement আছে। Miss Mull গান শেখালে। তার সঙ্গে Kensington Parkএ বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল না— তাই কিঞ্চিৎ অভিমান করেছে। একটুখানি একলা হবার জন্যে ভারী ইচ্ছে করছে। (এদের কাজকর্ম এদের আমোদপ্রমোদের মধ্যে যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন মানুষের ক্ষমতার অন্ত দেখা যায় না। এরাই রাজা বটে। এরা অল্পে সন্তুষ্ট হবার নয় ; এদের সুবিধে করবার এবং এদের আমোদ

দেবার জন্যে মানুষের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে মরছে। এরা গান শুনবে তাই সহস্র যন্ত্রের সহস্র তাল আশ্চর্য সংগতি রক্ষা করে ধ্বনিত হচ্ছে। কোথাও তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নেই। অসীম যত্ন, অসীম অভ্যাস। নাট্যশালায় কী অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার, কী আশ্চর্য সৌন্দর্যের মরীচিকা— কোনোখানে সামান্য ত্রুটি বা অশোভনতা নেই। দোকানে জিনিসপত্র কেবল সাজাতে ও সুন্দর করে রাখতে কত দুরূহ পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়েছে। জাহাজে যখন ছিলুম তখন ভাবতুম যে, এই জাহাজ চালানো কী বিপুল ব্যাপার! আমরা তো ডেকের উপর বসে হাওয়া খাচ্ছি, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখছি, কিন্তু কতশত লোক দিনরাত্রি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কী অসহ্য পরিশ্রম করছে— এক তো অবিশ্রাম যন্ত্র চালনা করে দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত কর। সেই যথেষ্ট, তার উপরে আরাম এবং সুখের জন্যে কী তীব্র চেষ্টা! জাহাজযাত্রীর সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত— খাবার ঘর, music saloon শাদা পাথর দিয়ে মোড়া, সুন্দর করে সাজানো, শত শত বিদ্যুদ্দীপ জ্বলছে। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম, কত বন্দোবস্ত! জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে শোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি! আমাদের দেশের লোকের ধ্যানের অতীত— এ রকম বিপুল-চেষ্টা-চালিত যন্ত্রকে আমাদের দেশের লোক failure মনে করত। কিন্তু ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে— *Song of Shirt* পড়লে তা টের পাওয়া যায়। এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি

বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায় তা হলে ক্রমে সেই অনাদৃত পয়সা বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে বিনাশ করে। আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত, দুর্বল, অজ্ঞান, বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেছে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা ক'রে কাজ করে ততই মঙ্গল— যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, স্বার্থ এবং পরার্থ, আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি। নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে, বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার তো সেই জন্যে মনে হয়— আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে, কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে, আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে। .য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে এ কি পেরিক্লীসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে— কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে, সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।)

সন্ধের সময় মেজদাদা হঠাৎ নাচের প্রস্তাব করলেন। Miss Mull তাঁর সঙ্গে খানিকটা নেচে আমাকে নাচবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কাটাবার অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু ক্রমে দেখলুম অভদ্র হয়ে পড়ছে। দু-চার পা নেচে থেমে গেলুম— এমন দু-তিন বার নাচিয়েছে। আমি বাজনার মাঝখানে থেমে যাই, এরকম জড়াজড়ি নৃত্য আমার ভারী বর্বর মনে হয়।

শনিবার। সকালে দোকানে বেরোনো গেল। অনেক জিনিস-পত্র কেনা এবং সুন্দর মুখ দেখা গেল। আজ আবার রাত্তিরে Drury Laneএ *Million of Money* দেখতে যেতে হবে।

M. Theatre দেখে আসা গেল। scenery খুব আশ্চয্যি। race course, সত্যিকার ঘোড়দৌড়, চৌঘুড়ি, সমুদ্রের মধ্যে পর্বত।

রবিবার। Oswaldদের বাড়ি গিয়েছিলুম, এক ফরাসি মেয়ে দেখলুম— অদ্ভুত। সে আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলে। বললে, Indianদের বড়ো ভালোবাসে। মেজদাদারা Kew Gardens দেখতে গেছেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে Miss Mull অনেক পীড়াপীড়ি করলে। রাজনারায়ণ আমাদের নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি রকম ঠাট্টাঠুট্টি আরম্ভ করেছে, সে কথঞ্চিৎ jealous হয়েছে।

সোমবার। ছোটবউ সল্লি আর বাবির চিঠি পেলুম। মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে— বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না। বাবিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করা গেল। Richmondএ ইন্দুর মেয়েদের দেখতে যাবার জন্যে মেজদা টানাটানি করছেন। চিঠি কাল শেষ করা যাবে। নোয়েল বেশ মোটাসোটা শক্ত হয়ে উঠেছে। লীলাকে তেমন ভালো দেখতে নেই। রানী আমার সঙ্গে ভাব করে নিয়ে Zoological Gardensএর গপ্প জুড়ে দিলে। ভারী মজা করে মিষ্টি করে ইংবিজি কথা কয়। ফিরে এসে ভাবে বোধ হল Miss M আর রাজনারানে একটু ঝগড়া হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে এই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে একটু খিটিমিটি বেধে গেছে। রাজনারায়ণ এমন স্পষ্ট করে তার jealousy প্রকাশ করে যে আমাকে ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। রাত্তিরে অনেকগুলো বাংলা গান গাইলুম। 'অলি বারবার'টা Miss Mএর ভয়ানক ভালো লেগেছে : It is so sweetly pretty, so quaintly beautiful and it sounds so pathetic with its minor tones! ওর নীচেই 'দে লো সখী দে', তার পরে 'কী হল তোমার'।

মঙ্গল। আজ সকাল থেকে shopping। সল্লি আর ছোট-

বউয়ের জন্যে ছুটো আয়না কিনেছি। সুরির জন্যে একটা ইলেক্‌ট্রিক-আলো-জ্বালা ঘড়ি কেনা গেল। কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিসপত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্ধের সময় 'busএর মাথার উপরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি আসা গেল। একজোড়া eye glasses কেনা গেল। আজকাল এখানে পথে-ঘাটে অগণ্য চশমা-পরা মেয়ে দেখতে পাই। আমার বিশ্বাস তাদের ভালো দেখতে হবে ব'লে তারা চশমা পরে। Miss M একজোড়া চশমা কিনে রেখেছে, কিন্তু তার চোখ খুব ভালো। কতকগুলো নতুন গান কিনে এনেছি, সেগুলো গেয়ে দেখা গেল। Miss M আবার 'অলি বারবার'টা গাওয়ালে। সেটা তার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। লোকেন Maryর সঙ্গে দেখা করতে গেছে— রাত ছুপুর বাজে, এখনো সে ফেরে নি। আমার বিশ্বাস, Maryকে লোকেন একটু বিশেষ ভালোবাসে। মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয়— ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে। আজ বাবির ছবির যতটা এঁকেছে দেখে এলুম— বোধ হয় রঙ দিলে বেশ হবে। শুক্রবারে দেবে।··· এখানে রাত ছুপুর, কলকাতায় ছটা···

বুধবার। সকালে আবার দোকানে বেরোলুম। বাবির জন্যে একটি বেশ ভালো lamp পছন্দ করবামাত্র লোকেন সেটার জন্যে পীড়াপীড়ি করে দাবি করতে লাগল। তাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু মনটা ভারী খারাপ হয়ে রইল। তখনি মনে মনে স্থির করলুম, কতকগুলো জিনিসপত্র কিনেই একেবারে পরের স্টীমার নিয়ে লন্‌ডন থেকে P & O জাহাজে চড়ে বসব— কিচ্ছু ভালো লাগছে না। Maple

এবং Spriggsএর দোকানে গিয়ে বাবির জন্যে কতকগুলো জিনিস কিনে নিলুম— আমার যা-কিছু সম্বল ছিল সমস্ত ফুরিয়ে গেল। Oswaldsএর ওখানে গেলুম, তারা আমাদের একটা tennis clubএর মতো জায়গায় নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে Miss O বলছিল, একজনের পক্ষে এক sisterই ঢের, কিন্তু আমার ইচ্ছে করে আমার আরও ভাই থাকত। tennis খেলে Oswaldsএর ওখানে গান গেয়ে এবং গানবাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গান-বাজনা করে শোবার ঘরে এসেছি। Good night! Good night! ···

বৃহস্পতি। আবার আমার সমস্ত plan ভেঙে গেল। মেজদার কিছুতে ইচ্ছে নয় যে আমি যাই, কাজেই থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এরকম আত্মসম্বরণ করা আবশ্যক। অনেকবার তো দায়ে পড়ে করতে হয়েছে— কিন্তু অভ্যেস হল কৈ? Miss Mকে নিয়ে, Oswaldsদের ওখানে গিয়ে তাদের কুড়িয়ে নিয়ে, French Exhibition দেখতে গিয়েছিলুম। পথে আসতে আসতে Miss M আমাকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেল। কথায় কথায় বলছিল : I am quick at everything। আমি ঈষৎ সহাস্যে বললুম : Quick to forget? সে সেই উপলক্ষে অনেক কথা বললে। কিন্তু ব'লেই তৎক্ষণাৎ আমার মনে মনে এমন ধিক্কার উপস্থিত হল! কথাটা এমনি আমার-মতন-নয় ব'লে মনে হল! মনে হল, আমি অজ্ঞাত-সারে লোকেনকে নকল করছি— সে যে রকম মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টার সঙ্গে flirt করে আমিও সেই চাল অবলম্বন করছি। কিন্তু তার সেটা বেশ স্বভাবতঃ আসে, তাকে বেশ মানায়। কিন্তু আমার মুখ থেকে আমার নিজের কানে ওটা এমন বিশ্রী শোনালো তার একটা কারণ বোধ হয়, Miss M আমার প্রতি কতকটা serious ভাব ধারণ

করেছে। সে আমাকে আরও কিছুদিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল, এবং ভবিষ্যতে ইংলন্ডে এলে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করছিল। একটু বিষণ্ণ নম্র বিগলিত ভাব। তাই আমার আরও তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হল।···

French Exhibitionএ যাওয়া গেল। অনেক ক্রেতব্য জিনিস দেখলুম। ডিনারে আমাদের পাশের টেবিলে একটা পার্টি আমাদের দিকে ভারী rudely stare করছিল— আমার সহ্য হল না— যখন ভেঙে গেল আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে deliberately তাদের out-stare করলুম। British stareএর মতো insolent জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে।

আমার ধারণা ছিল ইংরেজ মেয়েদের ভ্রূ এবং চোখের পাতা বিরল, কিন্তু সেটা ভয়ানক ভুল— বরঞ্চ বিপরীত।

শুক্রবার। সকালে মেজদাদার সঙ্গে Regent Streetএ বেরিয়েছিলুম। বাবির ছবি চমৎকার হয়েছে। ফিরে এসে সল্লিকে চিঠি লিখলুম। Brandএর বোনের ওখেনে সন্ধেবেলায় নিমন্ত্রণ ছিল। গেলুম। তাকে বেশ লাগল, বেশ refined। চমৎকার harp এবং পিয়ানো বাজায়। 'অলি বারবার' গানটা খুব তার ভালো লেগেছে। বলছিল, যদি আমাদের ঐরকম কতকগুলো দিশি গান Sullivanকে শোনাই তা হলে সে একটা Oriental Opera লিখতে পারে। আমার composition শুনে আশ্চর্য। আমি musicএর grammar কিছু না জেনে compose করতে পারি এতে সে অবাক।···

শনিবার। সকালে আবার Regents Streetএ যাওয়া গেল। সমস্ত দিন ঘুরে ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে গাড়ি করে আমি ফিরে এলুম। আমার বাঁ পায়ের শিরায় বড্ড ব্যথা হয়েছে। লোকেন আমাকে সন্ধের সময় বললে, আমার বাংলা গান শুনতে আজকাল বড়ো

ভালো লাগছে, তুমি কতকগুলো বাংলা গান গাও। জ্যোৎস্নার কাছে একটা 'মায়ার খেলা' ছিল, সেইটে নিয়ে প্রথম থেকে একটা একটা করে অনেকগুলো গাওয়া গেল। আমার বেশ লাগছিল, লোকেনেরও ভালো লাগল।··· Lyceum Theatreএ যাওয়া গেল। *Bride of Lammermoor* অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene! অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভালো— কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়— সেই আশ্চর্য। একটি boxএ দুটি মেয়ে বসেছিল, তার মধ্যে একটিকে চমৎকার দেখতে। একেবারে নিখুঁৎ ছোটো সুন্দর মুখ-খানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষায় আড়ম্বর নেই, কিন্তু সবসুদ্ধ যাকে dainty বলে তাই। অভিনয়ের সময় রঙ্গ-ভূমির সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজে আলো জ্বলে— সে স্টেজের উপরকার বক্‌সে বসেছিল, তার মুখের উপর স্টেজের আলো পড়ছিল, কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! সমস্ত backgroundটা অন্ধকার, কেবল তার আর্ধেক মুখ আলোকিত— কী সুকুমার সুন্দর মুখের রেখা! কী চমৎকার গ্রীবাভঙ্গী! আমি অভিনয়ের সময় প্রায় তার মুখের বিচিত্র ভাবের খেলা দেখছিলুম। সেও দূরবীন দিয়ে আমাদের অনেক ক্ষণ দেখেছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ততটা আনন্দ লাভ করে নি। কিন্তু নাট্যশালায় একান্ত নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে পরস্পরের প্রতি দূরবীন কষা আমার নিতান্ত খারাপ লাগে। আমি তো কিছুতেই পারলুম না, ভারী অভদ্র মনে হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলো প্রথা আছে যা প্রকৃতপক্ষে অভদ্র, সে আমাদের

কিছুতেই অভ্যেস হয়ে যাওয়া উচিত না— যেমন নাচ— দুরবীন কষা— গান-বাজনার সময়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

সেদিন French Exhibitionএ একজন বিখ্যাত artist-রচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই— কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখি দেখি, আর পৃথিবীর সর্বপ্রধান সৌন্দর্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্তের চরম সৌন্দর্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েছে। কিন্তু সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জা বোধ হয় আমি তাকে সহস্র ধিক্কার দিই। আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেলি যদি বড়ো হ'ত তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম। এ রকম উলঙ্গতা কী সুন্দর! এই ছবি দেখলে সহসা চৈতন্য হয়— ঈশ্বরের নিজহস্তরচিত এক অপূর্ব সৌন্দর্য পশু-মানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই দেহখানির শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম ভঙ্গিমার উপর বিশ্বকর্মার, সেই অসীমসুন্দরের, অঙ্গুলির স্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ সুকোমল নারীহৃদয়, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এরই মধ্যে বাস করে। তারই ভালোবাসা, তারই লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। এই উলঙ্গ চিত্রে রমণীর সেই হৃদয়ের কোমলতা এবং আত্মার শুভ্র জ্যোতি ব্যক্ত করছে, মানব-অন্তঃকরণের চিরপ্রচ্ছন্ন রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

রবিবার। আজ সতুর সঙ্গে churchএ যাবার কথা ছিল। খোঁড়া পা নিয়ে সমস্ত দিন পড়ে আছি। বাবির porcelainএর ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছে, সুন্দর লাগছে। কিন্তু মেজদাদা সেটা দখল করে রেখেছেন, আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমাকে না দেন। রাত্তিরে গান হল। Miss Oswald সতুর হাত দিয়ে আমাকে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোমবার। পা অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে। বিকেলের দিকে লোকেনের সঙ্গে Walleryর ওখানে গিয়ে একটা cabinet ছবি নেওয়া গেল। তারা অনেক যত্ন করে নানা positionএ নিলে। বললে splendid head— বোধ হয় আমার মুখশ্রী প্রসন্ন করবার জন্যে। Miss Oswaldএর ওখানে যাওয়া গেল। সে আমার একটা ছবি চাইলে— দিলুম। কতকগুলো বাংলা গান গাওয়ালে — বিশেষ রকম ভালো লাগল, বিশেষতঃ 'অলি বারবার'টা। ভরসা করি, এর মধ্যে চালাকি কিছু নেই। চাণক্য বলেছেন : বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রিষু রাজকুলেষু চ। এরা একে স্ত্রী তাতে রাজকুল। একজন musical পুরুষ বসে ছিল, সেও অনেক তারিফ করলে। birthday book এবং autograph bookএ নাম লিখে দিয়ে National Liberal Clubএ সিন্ধি বন্ধু আধ্বানির নিমন্ত্রণ উপলক্ষে dinner খেতে গেলুম। সেখানে Voyseyর সঙ্গে দেখা। তাকে বেশ লাগল, সে বাবামশায়ের প্রতি খুব ভক্তি প্রকাশ করলে। তার নিজের ইতিহাস অনেক শোনা গেল। Christianity ত্যাগ করার দরুন ঘরে বাইরে তাকে অনেক উপদ্রব সইতে হয়েছে। বললে, সব চেয়ে কষ্ট যখন নিজের ঘরের মধ্যে sympathyর অভাব দেখা যায়। আমাকে দেখে দেখে বললে, তোমার বোধ হয় কথাটা খুব নতুন বোধ হবে, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র আমার মনে হল ।ছিল

যিশুখৃস্টকে যে রকম আঁকে তোমাকে ঠিক সেই রকম দেখতে। আমি বললুম, এ কথা আমার পক্ষে নতুন নয়। clubটা একটা রাজ-প্রাসাদ বললেই হয়— চমৎকার পাথরের সিঁড়ি, খুব জমকালো, এবং যত রকম আরাম কল্পনা করা যেতে পারে তার বন্দোবস্ত আছে।

মঙ্গলবার। চিঠি পাওয়া গেল। বাবি লিখেছে, আর চিঠি লিখবে না। মেজদাদার কাছে আমার একলার বাড়ি পালাবার প্রস্তাব করা গেল, কিছু ফল হল না। বাবিকে চিঠি লিখতে বসা গেল।

বুধবার। কাল সন্ধে থেকে লোকেন Margateএ তার বন্ধু-সন্দর্শনে। আমি বসে বসে চিঠি লিখছি। Miss Mullএর কাছে একটু গান শিখলুম। 'যদি আসে' গানটা তার ভালো লাগল। লোকেন ফিরে এসেছে। আজ পয়লা অক্টোবর— এ মাসটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। কাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বচ্ছে, মেঘ করে রয়েছে, শীতও বেড়েছে। বোধ হয় রীতিমত বিলিতী weather আরম্ভ হল। মেজদার কেন এ দেশ ভালো লাগে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে— তিনি তো এখানকার হুড়োমুড়িতে তেমন যোগ দেন না। ইচ্ছে করলেই একটা-কিছু করা যেতে পারে, নিদেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দোকানগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে— এইটে মনে করেই মন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকে বোধ হয়।

বৃহস্পতি। নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা— আশ্চর্য অধ্যবসায়। বেচারার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে আমি তাকে আমার এক-স্যুট গরম কাপড় দিলুম। India Officeএ হয়ে দোকান হয়ে শ্রান্তভাবে বাড়ি-প্রত্যাগমন। মেজদা কাল আমাকে Birming-

hamএ নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই এখনি বসে বসে সল্লিকে তাড়াতাড়ি এক চিঠি লিখে দেওয়া গেল। আদবে ভালো লাগছে না।

শুক্র। Birmingham-যাত্রা। ইংলন্ড্ দেখতে বড়ো সুন্দর। Lee stationএ উপস্থিত ছিল। শহর দেখতে আমার আদবে ভালো লাগে না। electric tramএ চড়া গেল। electric tramএর কলকারখানার মধ্যে নিয়ে গেল, নির্বোধের [মতো] ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে হাঁ করে দেখতে লাগলুম। কিছুই বুঝলুম না, কেবল একান্ত শ্রান্ত হয়ে Mrs. Leeর ওখানে ডিনার খেয়ে হোটেলে এসে নিদ্রা।

শনিবার সকালে আবার বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের সন্ধানে বেরোনো গেল। এটা পোস্ট্ আপিস, ওটা ম্যুনিসিপাল আপিস, সেটা আদালত, এই করতে করতে একটা ছাপাখানায় যাওয়া গেল— সেখানে রঙিন ছবি ছাপা দেখা গেল। এটা দেখবার জিনিস বটে। সন্ধের সময় লন্ডনে ফিরে এসে Walleryদের ওখেন থেকে আমার ছবির প্রুফ পাওয়া গেল।

রবিবার। Voyseyর churchএ গিয়েছিলুম। বেশ লাগল। মনটা অনেকটা ভালো বোধ হল। ফিরে এসে লোকেনের ঘরে বসে গল্প করছি— খানিক বাদে Mrs. Palit এসে বললেন drawing roomএ রাজনারান আর Miss Mullএ খুব scene হয়ে গেছে। Miss Mull বসে বাজাচ্ছিল— তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল তার বাজনা শুনে আমি drawing roomএ যাই, অনেক ক্ষণ গেলুম না দেখে সে রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করছিল : Is Mr. Tagore out I wonder ? রাজনারান বললে : No. Evidently your signal has not attracted him। Mrs. Palit তাকে

বললেন : Is that your signal Miss Mull ? সে রাগ করে piano বন্ধ করে বললে : I don't understand what you say ! ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমাকে নিয়ে রাজনারানের সঙ্গে তার ক্রমিক খিটিমিটি চলছে। Oswaldদের ওখেনে বিকেলে গিয়েছিলুম, বাংলা গান হল। Mrs. Oswaldএর ভালো লাগল। এখেনে ফিরে এসে সন্ধের সময় গান। Miss Mull 'অলি বারবার'টা আবার গাইতে বললে, সেটা তার ভারী ভালো লাগে। সে বললে : I don't know what is in it— it is so very pathetic ! আজ বিকেলে লোকেনে আমাতে দুজনেই পাগড়ি প'রে বেরিয়েছিলুম। রাস্তার লোকের খুব মজা লেগেছিল। আমরা কালো মানুষ ঠিক যদি ইংরেজের ছদ্মবেশ ধারণ করি তাতে এ দেশের লোকের অদ্ভুত মনে হয় না। যখন রাস্তার মেয়েরা আমাকে দেখে হাসে তখন আমার চেহারার গর্ব অনেকটা চলে যায়। আজ ৫ই। এখনো পাঁচ সপ্তাহ।

সোমবার। কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এই রকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই, মনে হয় কোন্‌দিন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেক অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্ছে। আজ চিঠি আসবার দিন। বাবির চিঠি পাওয়া যাবে না। আমি ঠিক করেছি বাড়ি ফিরব— আর নয়।

মঙ্গলবার। Savoy Hotelএ মনোমোহনের ওখানে lunch খেয়ে P & O আফিসে Thames Steamerএ passage engage করে নিশ্চিন্ত। বৃহস্পতিবারে ছাড়বে। কাল রাত্তিরে Carlyle Societyতে গিয়েছিলুম। চুরোটের ধোঁওয়ার মধ্যে John Stirbing-এর life সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। মেজদাদা Newman সম্বন্ধে একটুখানি

বললেন, সকলের খুবই ভালো লেগেছে। রাত্তির দুটো পর্যন্ত আমার দেশে ফেরা সম্বন্ধে সমালোচনা করা গেছে। মঙ্গলবার রাত্তিরে লোকেন আমাকে Oswaldদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

বুধবার। সমস্ত দিন হিসেব করতে এবং জিনিস কিনতে গেল। মেজদাদার কাছে অনেক ধার হয়ে গেছে— তিনি আমাকে অমনি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আমার ইচ্ছে হল না। মেজদাদার টাকাতেই যদি বাবিদের জন্যে জিনিস কিনলুম তা হলে আমার আর দেওয়া হল কই? অল্পে অল্পে শুধে ফেলব। কেন মরতে বিলেতে এসেছিলুম কে জানে। বাড়িতে চিঠি লিখলুম। Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' ব'লে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে : Mr. T, I shall remember you। আমি অপ্রতিভ হয়ে নিরুত্তর বসে রইলুম।

বৃহস্পতি। আজ তো Thames জাহাজে উঠলুম। আমার cabinএ একজন civilianএর জিনিসপত্র দেখে মন বিগড়ে গিয়েছিল। তার পরে দেখলুম সে নেহাত কাঁচা, এই প্রথম ভারতবর্ষে যাচ্ছে। আমাকে দেখে ভারী খুশী। জাহাজে কখন কী করতে হয়, কোথায় কী, আমাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নিলে। আমি তার মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছি। মল্লিক এবং বাঁড়ুজ্জের ভারী প্রশংসা করলে। Lord Riponএর দলের লোক। সেখেনে গেলে কী হয় কে জানে। বোধ হচ্ছে Irishman। জাহাজে ভয়ানক ভিড়। dinner tableএ আমার ঠিক সামনেই রাঙা টুক্‌টুকে ঠোঁট- জ্বল্‌জ্বলে চোখ- এবং মিষ্টি হাসি- ওয়ালা একটি মুখ পাওয়া গেছে। আমাকে সকলেই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছে।

শুক্রবার। চমৎকার সকাল হয়েছে। সমুদ্র স্থির, আকাশ পরিষ্কার, সূর্য উঠেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমাদের দক্ষিণে ভোরের বেলা অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কোয়াশার আবরণ উঠে গেল, Isle of Wightএর পার্বত্য তীর এবং Ventnor শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল। পর্বতের ঢালুর উপরে সমুদ্রের তীরে শাদা শাদা বাড়ি বিজ্‌বিজ্‌ করছে— লিলিপুট শহরের মতো। এ জাহাজে বিষম ভিড়— এক কোণে নিরিবিলি চৌকি নিয়ে বসে লেখবার যো নেই এবং জায়গাও নেই। Brindisi থেকে আরও অনেক লোক উঠবে। ভরসা করি আমাদের cabinএ আর কেউ আসবে না। আমাদের Massilia জাহাজের purserকে এ জাহাজে দেখলুম। সে আমাকে বললে, তোমার যখন যা আবশ্যক হবে আমাকে জানিয়ো। ডিনার-টেবিলে আমার পাশেই সে আসন গ্রহণ করেছে; ডেকের উপর আমাকে পাশে নিয়ে হট্ হট্ করে বেড়াতে চায় এবং বিস্তর গল্প বলে। লোক খুব ভালো সন্দেহ নেই, নইলে আমাকে বেছে নিলে কেন— সমজ্‌দার বটে। কিন্তু সর্বদা আমার প্রতি মনোযোগ দিলে আমার লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। Wallaceএর *Darwinism* পড়ছি, বেশ লাগছে— ইচ্ছে করছে বাংলায় তর্জমা করতে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

আজ ডেকে বেড়াতে বেড়াতে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল, সে কর্তাদাদামশায়কে জানত। একটা বড়ো সেনাপতি গোছের লোক, Egyptএ যাচ্ছে। অনেক কথা হল। English Governmentের কথা হতেই আমি ইংরেজের ব্যবহার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললুম। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বললে, আমাদের সময়ে ঐরকম ছিল বটে, কিন্তু এখনো আছে না কি? শুনে স্বজাতির

উপর ভারী চোট প্রকাশ করলে। বললে, লোকে বলে ভারতবর্ষের বাজারে ভারী ঠকায়, কিন্তু Bond Streetএর চেয়ে ঢের ভালো ; নিম্নশ্রেণীয় ভারতবর্ষীয়েরা নিম্নশ্রেণীয় ইংরেজদের চেয়ে যে কত ভালো তা বলতে পারি নে। বললে, হিন্দুরাই যথার্থ Christian ; তাদের ক্ষমাপরায়ণ সহিষ্ণু নম্রতা, তাদের আন্তরিক সহৃদয়তা, খৃস্টানদের অনুকরণীয়। লোকটা খুব ধার্মিক, আমাকে খৃস্টধর্মে লওয়াবার কতকটা চেষ্টা করলে। আমার ইংরিজি ভাষা শুনে খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে। জিজ্ঞাসা করলে আমি Oxfordএ পড়েছি কি না। আমি বললুম, না। —কোনো দেশের কোনো কলেজে পড়েছি কি না? —না। শুনে অবাক্। সে বললে, আমি India Officeএ থাকি— অনেকটা জানতে পারি— আমাদের সময়ের চেয়ে এখনকার ভারতবর্ষীয় ইংরেজরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়। আমি বললুম, আমার উল্টো বিশ্বাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে ইংরেজের মেশামিশির কথা বললুম। সে বললে : His was the only solitary instance। আমাকে বললে, যদি কখনো পুনশ্চ ইংলন্‌ডে আসি তা হলে India Officeএ তাকে সন্ধান করে যেন look up করি।— সমুদ্র আশ্চর্য শান্ত এবং সমস্ত দিন রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার। একটা নিরিবিলি কোণ পেলে কবিতা লিখতুম। জাহাজে ক্রমে আমার বন্ধুবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছি।

ইংরেজ মেয়েদের চোখ আমার ক্রমে ভালো লাগছে— মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো এমন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, প্রায়ই ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন। আমাদের দেশের মেয়েদের চোখে এক রকম আবেশের ভাব আছে, এদের তা মোটে নেই।

শনিবার। Bay of Biscayতে পড়া গেছে। সমুদ্র কিঞ্চিৎ

অশান্ত। সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর-একজন সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল, তাকে Archer -এর studioতে দেখেছিলুম— টেরা। Turnbull— ভূতপূর্ব ম্যুনিসিপাল সেক্রেটারি। সে বলছিল, আমাকে যদি কেউ দশ হাজার টাকা দেয় তা হলেও আমি কলকাতা ছেড়ে ইংলন্‌ডে বসতি করি নে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? সে বললে, ইংরাজ জাত বড়ো উদ্ধত, স্বার্থপর, গর্বিত ইত্যাদি— ফরাসীরা ওদের চেয়ে ঢের ভালো। আজ কখনো রোদ্‌দুর কখনো মেঘ করছে, খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। কাল চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা গিয়েছিল, আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে এমন সুন্দর রঙ হয়েছিল। আজ মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্র মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে।

রবি। কাল রাত্তিরে আবার সেই রকমের স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্নে বোধ হচ্ছিল মনের কষ্টে আমি যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি। ঠিক এই ধরণের স্বপ্ন কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। সকালে আমার সহযাত্রী Connollyর সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সে বললে, আমি ভারতবর্ষে কখনো Anglo Indian দলে ভিড়ব না, আমি সেখানকার দেশের লোকের সহায় এবং বন্ধু হব। আসবার আগে Lord Ripon এবং তার private secretaryর সঙ্গে এ বিষয়ে তার অনেক কথা হয়ে গেছে। আজ সকালবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন। কুয়াশা কেটে গিয়ে বেশ রোদ্‌দুর উঠেছে। ছাতের চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে, তাই আজ অনেকটা snug বোধ হচ্ছে— আজ তেমন ঠাণ্ডা নেই। এ জাহাজে একটি মেয়ের সুন্দর নীল চোখ এবং চমৎকার ঠোঁট— হাসলে বেড়ে দেখায়। আমার ডিনার টেবিলের সঙ্গিনীর চেয়ে একে অনেক ভালো দেখতে। এর মুখের ভাবে বেশ একটু কোমল

নম্রতা আছে, উগ্রতা কিছুমাত্র নেই। আজ আর-এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করে নিলে। You belong to the great Tagore family of Calcutta ? আমি গান গাইতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলে আমি বললুম, হাঁ। সে বললে Colonel Chatterton ব'লে এক মস্ত musician Brindisi থেকে আমাদের জাহাজে উঠবে, সে এলে আমাদের অনেক রকম আমোদ প্রমোদ হবে; আমাকেও গাওয়াবে। *Darwinism* শেষ করা গেল। খুব ভালো লাগল, বিশেষতঃ শেষ chapter। Spiritual Manএর মধ্যেও survival of the fittest নিয়ম বোধ হয় চলছে — তবে তার জীবন মৃত্যু অন্য রকমের। যখন ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' তখন এই spiritual survival প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা যে আত্মা পেয়েছি তারই সফলতা চেয়েছিলেন।— চমৎকার সূর্যাস্ত। সন্ধ্যার রঙে জল এবং আকাশে এক রকম শারীরিক লাবণ্য প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন তার মধ্যে জীবনের এবং যৌবনের পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।— Wallace পড়ে আমার মনে এই একটা চিন্তার উদয় হয়েছে যে, আমাদের যে অংশ জন্তু সেই অংশই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং natural selectionএর নিয়ম -অনুসারে সেই অংশ ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু আমাদের অনেকগুলি মানবচিত্তবৃত্তি আছে যা আমাদের জীবনরক্ষার পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক নয়। সুতরাং জীবনসংগ্রামের নিয়মানুসারে সেগুলো কী করে উদ্ভাবিত হল কিছু বোঝবার যো নেই। আমাদের ধর্মভাব জীবনরক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক, এমন-কি অনেক স্থলে বাধাজনক। উদ্ভিদ এবং জন্তুদের যা-কিছু আছে সমস্তই তাদের আবশ্যক, অথবা অতীত আবশ্যকের অবশেষ, কিন্তু

আমাদের প্রধান চিত্তবৃত্তিসকল আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত। এ পর্যন্ত প্রমাণ হয় নি সৌন্দর্য আমাদের জীবনের পক্ষে আবশ্যক, যে জাতির মধ্যে শিল্পচর্চা অধিক তারা অন্য জাতির চেয়ে বলিষ্ঠ বা তাদের জীবনীশক্তি অধিক। গ্রীকরা রোমের কাছে পরাভূত হয়েছিল। যারা সংগীতচর্চা করে জীবনসংগ্রামে তাদের বিশেষ কী সুবিধে বোঝা যায় না। অতএব এসকল মনোবৃত্তি আবশ্যকের নিয়মানুসারে আবির্ভূত হয় নি— সৌন্দর্যপ্রিয়তা মানবের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক ব'লে ধরে নিতে হবে। এই-সকল আপাততঃ অনাবশ্যক চিত্তবৃত্তি আমাদিগকে কোন্ উচ্চতর আবশ্যকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কে বলতে পারে।

সোমবার। আজ চৌকিতে আরামে বসে *Modern Thoughts & Modern Science* পড়ছিলুম— এক দল লোক এসে আমাকে quoits খেলতে নিয়ে গেল। stupid খেলা। আজ রাত্তিরে বোধ হয় নৃত্য হবে। ইংরেজ-সমাজের একটা আমার চোখে খুব ঠেকে— এখানে মেয়েরা পুরুষদের প্রতি অনায়াসে rude হতে পারে, public opinion তাতে কোনো বাধা দেয় না। ভদ্রতার নিয়ম যে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে বিশেষ তফাত হবে তার কারণ আমি বুঝতে পারি নে। হয়তো হতে পারে গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বেশি মেশামিশি সেখানে স্ত্রীলোকের সেই কারণে কতকটা প্রখরতা থাকা আবশ্যক। যাই হোক, তার চেয়ে আমাদের মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ কোমলতা এবং মমতার ভাব আমার ঢের বেশি ভালো লাগে।— এরা সবাই মিলে আমার কোণ থেকে আমাকে উপ্‌ড়ে বের করবার চেষ্টায় আছে।

Concertএ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল। অনেক মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে। পরিচিত-

সংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠছে। গানের পর খুব এক-চোট নাচ হয়ে গেল। আমি নাচি কি না অনেকে সন্ধান নিলে। আমি বললুম : I used to dance— but I am out of it now— I am sure to come to grief if I attempt it। মিস্, ঠিক নামটা মনে পড়ছে না, বললে : Do try ! আমি বললুম : Excuse me ! I belong to the obscure genus of wall-flowers। নাচ দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়েছিল। Gounodর *Serenade* এবং *If* গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্বক গলা ছেড়ে গান গাই— বাবি শুনলে বোধ হয় অনেক উৎসাহ দিত।

আজ দুপুরবেলা Portugalএর একটুখানি রেখা দেখা গিয়েছিল।

মঙ্গল [১৪ অক্টোবর]। Gibএ পৌঁছনো গেল। ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে। Gibralterএর পাহাড় মেঘে অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। দুটি Sisters of Mercy 'alms for the poor' ব'লে সকলের কাছে কাছে ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি তাদের একটি অর্ধ স্বর্ণমুদ্রা দিলুম, একটু আশ্চর্যভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে— অধিকাংশ ইংরেজসন্তান প্যাণ্টলুনের পকেটে হাত গুঁজে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন ক্রোশ তিনেকের মধ্যে আর কোনো জনমানবের সম্পর্ক নেই।

মানুষের সবলতা দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে উদয় হল। নিম্নশ্রেণীয় জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর চেয়ে অধিকতর পরিণত ও বলিষ্ঠ। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলবার আগে পড়তে হয় না, মানুষকে

সহস্রবার পড়তে হয়। জন্তুদের জীবনের প্রসারতা সংকীর্ণ, এই জন্যে আরম্ভকাল থেকেই তারা শক্ত সমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এই জন্যে সে বহুকাল পর্যন্ত অপরিণত দুর্বল। যে-সকল মানুষের অত্যন্ত অবিচলিত সংকল্প, প্রচণ্ড strong will, যারা কখনো ভ্রমে পড়ে না, চিরদিন শক্তভাবে চলে, তাদের জীবনের মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্ত প্রসারতার ব্যাঘাতজনক কঠিন সংকীর্ণতা আছে— তাদের জীবনের পরিণতি অতি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়। instinct ঠিক পথে চলে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্ততঃপূর্বক ভ্রমের মধ্যে দিয়ে যায়। instinct পশুদের এবং বুদ্ধি মানুষের। instinctএর গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষলক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। আবশ্যকের আকর্ষণ অতি সাবধানে আমাদের সুবিধার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়— স্বার্থপরতার মধ্যেই তার সীমা— সৌন্দর্য ও ভালোবাসার আকর্ষণ আমাদের সহস্রবার ধুলায় ফেলে দেয়, অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু তার সীমা কোথায় কে জানে! অনন্তের দিকে যার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই আপনাকে পদে পদে দুর্বল বলে অনুভব করে— ক্ষুদ্র সীমা ও সংকীর্ণ সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে যার জীবনের স্বাভাবিক বিলাস সে যতটুকু মৎলব করে ততটুকু ক'রে ওঠে, যতটুকু চায় ততটুকু আদায় করে নেয়। সেই সবল— তার সবলতা দেখে আমরা আপাততঃ হিংসা করি, কিন্তু চিরজীবনের raceএ একদিন হয়তো তাকে আমরা অবহেলে ছাড়িয়ে যাব। মানবসন্তান ব'লে বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা, বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদের শিখতে যায়। অনন্তের সন্তান ব'লে এতকাল ধরে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য। সেই আমাদের

চিরজীবনের লক্ষণ। তাতেই আমাদের ব'লে দিচ্ছে এখনো আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের শেষ হয় নি। শৈশবই যদি মানুষের শেষ হত তা হলে মানুষের মতো অপরিস্ফুটতা প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যেত না, আমাদের এই অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনই যদি আমাদের শেষ হত তা হলেই আমরা একান্ত দুর্বল সন্দেহ নেই। কিন্তু শৈশবের দুর্বলতাই যেমন প্রকাশ করছে তার উন্নততর ভবিষ্যৎ আছে, তেমনি মানুষের এই দুর্বল ইহজীবনই তার ভবিষ্যৎ উন্নততর জীবনের সূচনা।

পৃথিবীর কত দুর্বল, কত পতিত, কত অপরাধী, পৃথিবীর কত বলিষ্ঠহৃদয় সাধুর চেয়ে প্রকৃতপক্ষে মহৎ এবং কুলীনবংশোদ্‌ভব তা চিরজীবনের হিসাবে ক্রমশঃ ব্যক্ত হবে।

. .

natural selectionএর নিয়ম মানুষ পর্যন্ত এগিয়ে এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে— তার শেষ ফল কী ভালো করে বুঝে ওঠা যায় না। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যপ্রেম অনেক স্থলে আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের হানিজনক। শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়— অনেক বড়ো বড়ো শিল্পী বিস্তর দারিদ্র্যকষ্ট এবং জীবনের ক্ষতি স্বীকার করে শিল্পচর্চা করেছে এবং এই রকম ক'রেই অল্পে অল্পে শিল্পবিদ্যার উন্নতি হয়েছে, natural selectionএর নিয়মে এর কোনো কারণ পাওয়া যায় না। জীবনের ক্ষতির মধ্যে দিয়েই উন্নতি— এ কেবল মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে দেখা যায়। বিজ্ঞান সম্প্রতি মানুষের কাজে লেগেছে, কিন্তু তার আরম্ভকালে কেবলমাত্র নিস্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা থেকে যখন বিবিধ শারীরিক দুর্গতি এবং প্রাণপণ স্বীকার ক'রে বহুকাল ধ'রে মানুষ বিজ্ঞানের চর্চা করে এসেছে তার কারণ কী? দুয়ের মধ্যেই দেখা

যাচ্ছে রহস্যের প্রতি মানবমনের অসীম আকর্ষণ— এমন-কি অনেক স্থলে তা জীবনাসক্তিকেও ছাড়িয়ে ওঠে। আমাদের যা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা এই 'natural selection' নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরা প্রাণ সমর্পণ করে জ্ঞান পেয়েছি, ধর্ম পেয়েছি, শিল্প রচনা করেছি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা যে ক্রমে বাড়ছে তা অনেক পরিমাণে তার অকারণদুঃখ-জনক এবং তার জীবনরক্ষার বিরোধী, কিন্তু তবু কোন্ নিয়মানুসারে আমরা উত্তরোত্তর তাকে এত উচ্চ আসন দিচ্ছি?

. .

পৃথিবীতে কোনো-একটা সীমায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে থেমে থাকবার যো নেই— তা হলেই আবার হুহু করে পিছিয়ে পড়তে হয়। আপনাকে কোনো-এক স্থানে বজায় রাখতে হলেও অবিশ্রাম চেষ্টার আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই চেষ্টার বাইরে এসে পড়ে যা পেয়েছিলুম তা উত্তরোত্তর হারাচ্ছি। Australiaর apteryx পাখির মতো আমাদের ডানা ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে — কিন্তু এখনকার জীবনসংগ্রামের মধ্যে পড়ে আবার কি সেই ডানা আমরা ফিরে পাব? কিম্বা আত্মরক্ষার উপযোগী আর কোনো রকম নতুন ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হবে?

. .

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যা, প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন প্রাণ, খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ এবং আলোক প্রচ্ছন্ন আছে— কিন্তু আমাদের কাছে তা ঘোর অন্ধকারময়, শীতল, নিবিড়কৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তূপ। অগ্নিশিখা যদি না থাকে তা হলে গবেষণাদ্বারা

পুরাকালের মধ্যে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড তুলে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। বরঞ্চ য়ুরোপীয়েরা তাকে ব্যবহারের মধ্যে আনতে পারে, কারণ তাদের হাতে সেই অগ্নিশিখা আছে। আমরা তাকে নিয়ে কেবল খেলা করব, কিন্তু তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারব না। বর্তমানকালে প্রাচীন আর্যশাস্ত্র নিয়ে আমরা যে রকম খেলা আরম্ভ করেছি তাই দেখে আমার মনে এই কথা উদয় হল। আমরা মনে করছি পুনর্বার মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে টিকি প্রচলিত করে এবং হবিষ্যান্ন খেয়ে আমরা প্রাচীন আর্যজাতি হব। এ দিকে য়ুরোপীয়েরা আমাদের শাস্ত্র থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও শব্দবিজ্ঞান উদ্ধার করছে, আমরা যে যার ঘরে বসে নবোদ্‌ভূত টিকি -আন্দোলন-পূর্বক তাদের পরম মূর্খ বলে বিদ্রূপ করছি।

আজ আর-একজন সহযাত্রীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হল। সে নতুন ভারতবর্ষে যাচ্ছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে তাকে অনেক কথা বললুম। সে বললে : English people are very selfish, they can be very nice and all that so long as their self-interest is untouched but ....

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মস্ত জোয়ান, মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফ -ওয়ালা, গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী উল্লেখ করলে, পাখাওয়ালারা পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। গৌরাঙ্গ বললে, তার উপায় হচ্ছে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং তাই নিয়ে উভয়ে মিলে ঘোঁট চলতে লাগল। আমার এমন অন্তর্দাহ হচ্ছিল বলতে পারি নে। এদের এমন সভ্যতা যে, এদের মেয়েদের পর্যন্ত দয়ামায়া নেই।

এই-রকম-ভাবে যারা সর্বদা কথা কয় তারা যে অনায়াসে পরম ঘৃণার সঙ্গে আমাদের দেশের গরিব দুর্বল বেচারাদের খুন করে ফেলবে তার আর বিচিত্র কী? আমি তো সেই অপমানিত পদদলিত জাতির একজন। কোন্ লজ্জায় কোন্ মুখে আমি এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং ভদ্রতার দন্তবিকাশ করি! আমার নবপরিচিত বন্ধু আমার পাশে বসেছিল তাকে আমি বললুম, আমার এই ভারী আশ্চর্য মনে হয়, তোমাদের মেয়েদের মনেও দয়া নেই? সে বললে: Our women are quite callous and indifferent. Where it is fashionable to show pity they perform their part beautifully well— where it is just the other way they show an amazing lack of the so-called womanly quality। এ দিকে সভা ক'রে, সমিতি করে, চাঁদা তুলে মহাসমারোহের সঙ্গে দয়া করে থাকেন, অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে যেখানে তাঁদের চোখের সামনে একান্ত অসহায় দুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন চলছে সেখানে দয়ার উদ্রেক নেই এবং তাই নিয়ে এই রকম নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বর্বরভাবে আন্দোলন! ইংরিজি ভাষা আমার তাড়াতাড়ি আসে না, বিশেষতঃ মন যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। আমি বসে বসে মনে মনে ইংরিজি বানাতে লাগলুম: A gentleman is a gentleman whatever inconveniences he may have to put up with. And I think it is a gross act of cowardice to hit a fellow who can't return you blow for blow. Yes, admittedly we are a weaker people and you are very strong with your brute strength. But muscular superiority is not a thing to be particularly proud of. Perhaps you will say, 'Aren't we your

superior in any other respect ?' Well, you may be for aught I know but certainly you don't show it when you strike a weak helpless poor man. And for what ? Imagine a miserable creature who has been working all day with perhaps only one meal in the early morning, gives up his night's rest for the chance of earning a few more pice, and can you wonder that he should doze off to sleep and couldn't keep himself awake even to save his life ? And punkhapulling is the sovran remedy for insomnia. If ever you are troubled with sleeplessness just take your punkhawalla's place and pull your own punkha. It will do you more good than any medicine in the world. If the author of Vice Versa could write a story reversing the positions of the punkhapuller and his master it could be made a source of infinite amusement and, I hope, of instruction to the Anglo-Indian.

You always try to set our social shortcomings against our political aspirations and say 'The people who have early marriage is not fit for self-government.' We may with greater justice say, people who bully their weaker fellow-beings, who habitually ill-treat their servants who have not the power to retaliate, who indulge in barbarous exercise of brute power whenever they imagine themselves perfectly secure,

are not fit to govern any nation. Of course, moral retribution comes very slowly, but surely— it very often has no immediate means of revenge like the cowardly kick that ruptures spleen, but it is all the more thorough and unrelenting in its action. Even if these repeated insults do not arouse our miserable people from their lethargy and goad them to take God's revenge in their own hands, this unbridled exercise of tyranny is sure to react on your national character; this growing habit of revelling in the wild display of gross physical power will be one of the potent sources of your national downfall. It will undermine the true love of freedom on which your greatness rests— and maltreated humanity will thus have its awful revenge by depriving you for ever of the only source of all real powers.

What I cannot understand is how that your ladies, who are ever ready with their noisy demonstrations of pity where their pity is very often superfluous and even harmful, do not feel for the wretches who are treated in such heartless manner by their husbands and brothers before their eyes. We thank God that our early marriages and myriad other social evils have not produced such utter heartlessness in our women.

যা হোক আমার বুদ্ধি যতই বাড়তে লাগল চোর ততই দূরবর্তী হতে লাগল। তারা অন্য নানা কথায় গিয়ে পড়ল, আমি আর কিছু বলবার সময় পেলুম না— কেবল নিষ্ফল আক্রোশে রক্ত গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইংরিজি শিক্ষার অভাব আর কখনো এমন অনুভব করি নি। কোনো কিছু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজেকে এমন stupid বলে মনে হয়! কিন্তু মজা দেখেছি এক-একজন লোকের সঙ্গে এবং এক-একটা বিষয়ে আমি বেশ বলে যেতে পারি। Evansএর সঙ্গে যখন আমার আলোচনা চলত আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে যেতুম, বেশ গুছিয়ে বলতে পারতুম। কিন্তু যখন excited হয়ে ওঠা যায় এবং যখন ভালো রকম করে বলা বিশেষ আবশ্যক হয় তখন অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে উঠে কণ্ঠরোধ করে দেয়— গুছিয়ে নেবার সময় পাওয়া যায় না। এই অবসরে কিছু বলে নিতে পারলুম না ব'লে আমার নিজের উপর এমন বিরক্ত বোধ হচ্ছে! আমি সত্যি সত্যি এমন stupid, অথচ আমার বুদ্ধি নেই এ কথা বলতে পারি নে। ঘরে বসে বসে অনেক বুদ্ধি জোটে, কিন্তু ঠিক আবশ্যকের সময় কোনোটাকে ডেকে পাওয়া যায় না। — cabinএ ফিরে এসে Connollyর কাছে আমার মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করতে লাগলুম। আমি বললুম: It makes me feel wild। সে বললে: I can quite understand your feeling। ব'লে অনেক ক্ষণ দুজনে কথা হল। তার পরে ছাতে গিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গেও এই নিয়ে আন্দোলন করে মন কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হল। এমন সময়ে একজন lady এসে আমাকে গান গাইতে ডেকে নিয়ে গেল। *Good Night— Chantez— Ave Maria* গাইলুম। আমার গলার জন্যে খুব প্রশংসা পেয়েছি। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলে কোথায় আমার শিক্ষা। আমি বললুম মস্ত professor

আমার nieceএর কাছে। তার পরে 'অলি বারবার'টা গাইতে হল। খুব ভালো বললে।

বুধবার [১৫ অক্টোবর]। সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে আমার খুব ভালো লাগে আমি দেখছিলুম ক'দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমার stupidity-বশতঃ আমি ধরা দিই নি। সে কাল রাত্তিরে আপনি এসে বললে : Aren't you going to sing? আমি কেবল বললুম : Yes। ব'লে গান গাইতে গেলুম। আজ সকালে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। তার মুখে এমন একটি প্রশান্ত গম্ভীর সুমিষ্ট earnestness আছে— এমন সুন্দর চোখ নাক এবং ঠোঁট— আমার ভারী ভালো লাগে। আমার বোধ হয় আমাকেও তার মন্দ লাগে না। একজন Australian মেয়ে আজ আমার সঙ্গে আলাপ করলে। তার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে গল্প চলেছিল। ক্রমেই গরম পড়ছে। আজ পরিষ্কার দিন, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই বলছে : What a lovely morning! আমি বলছি : Isn't it! দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূল একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। আমাকে বারবার quoits খেলতে অনুরোধ করেছিল, আমি অনেক করে এড়ালুম। এরা সকল বিষয়েই gambling ধরেছে।

আমার নববন্ধুর সঙ্গে ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। Anglo-Indian মেয়েদের হৃদয়হীনতার প্রসঙ্গে বলছিল, এখনকার মেয়েরা বড়ো হৃদয়হীন হয়ে গেছে— মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে একটা ideal আছে, কিন্তু উত্তরোত্তর ক্রমশই তাতে আঘাত লাগছে। বলছিল, 'ছোটো ছোটো বিষয়ে দেখা যায় একজন মেয়ে একটা গাড়ির ঘোড়াকে যত হয়রান করে ঘুরিয়ে বেড়াতে পারে একজন পুরুষ তেমন পারে না। তাদের সমস্ত হৃদয় অসীম

কাপড়-চোপড় সাজসজ্জার মধ্যে অহর্নিশি এত ব্যস্ত থাকে যে বাস্তবিক কোনো রকম অসুবিধাজনক বা আরামের-ব্যাঘাত-জনক দয়ার কাজ করা তাদের অনভ্যস্ত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষীয়ের প্রতি দয়া প্রকাশ করার মানে অসুবিধে সহ্য করা, চক্ষুপীড়ক দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করা, ফ্যাশানের বিরুদ্ধাচরণ করা— সুতরাং তা লেডির পক্ষে অসম্ভব। যাকে বলে luxury of sentiment, আরামসংগত অশ্রুবর্ষণ, সুশোভন দয়া, তাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ।'— লোকটা বোধ হয় কোনো মেয়ের কাছে আঘাত সহ্য করেছে, খুব যেন অন্তর্‌বেদনার সঙ্গে কথা কচ্ছিল।— আর-এক সময়ে কথায় কথায় বলছিল তার এক ছোটো বোন boyদের সঙ্গে বেশি মেশে, তার ভাইদের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বলো দেখি, আরও অনেকের কাছে ঐ কথা শুনেছি। সে বললে : I suppose girls find their brothers much nicer than their sisters. Sisters are so spiteful to each other। বলছি : মেয়েদের বিরুদ্ধে মেয়েরা যেমন তীব্র হতে পারে এমন আর কেউ নয় : However I have my ideal of a woman somewhere in my heart— a fellow must have something of that kind— but I have given up all hopes of meeting her in the region of Reality। লোকটাকে আমার বেশ লাগছে— খুব অল্প বয়স, পড়াশুনো ভালোবাসে, মন খুলে কথা কয়। আমার সঙ্গে খুব বনে গেছে। শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ। এ লোকটা কারও সঙ্গে মেশে না। একলা একলা বসে বসে বই পড়ে এবং ভয়ানক হাসে।

ডিনারের পর আজ আবার নাচ আরম্ভ হল। খানিকটা দেখে আমার মন বিগড়ে গেল। আমি একটা ঘোর অন্ধকার কোণে

বেঞ্চির উপর বসে নানা কথা ভাবছিলুম, মন্দ লাগছিল না। সমুখে অন্ধকার রাত্রি এবং অন্ধকার সমুদ্র, থেকে থেকে phosphorescence ঢেউয়ের মাথার উপরে অগ্নিরেখা এঁকে যাচ্ছিল— এমন সময়ে ধীরে ধীরে সেই Australian মেয়েটি আমার পাশে এসে বসল এবং অল্পে অল্পে গল্প জুড়ে দিলে। ক্রমে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। সে আমাকে বললে, চলো music saloonএ গিয়ে আমরা গান বাজনা করিগে। সেখেনে গিয়ে গান আরম্ভ করে দেওয়া গেল। ক্রমে ক্রমে লোক জড়ো হতে লাগল। আজ আমাকে বারবার করে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গাইয়েছে। *Ave Maria* এবং আর দুয়েকটা গান বেশ রীতিমত ভালো করে গেয়েছিলুম। বিস্তর অপরিচিত মেয়ে জানলার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বহুল সাধুবাদ দিয়ে গেল। আজ ভাবে বোধ হল আমার গান এদের বাস্তবিক ভালো লেগেছে— Indianএর গান ব'লে কেবলমাত্র বিস্ময় নয়। এইমাত্র Connolly এসে আমাকে বলে গেল : I say, Tagore, you sang awfully well this evening। আমি আগে যে রকম গলা চেপে গাইতুম এখন দেখছি সেটা ভারী ভুল। Then [you'll] remember me ব'লে একটা গান গাইলুম। আমার নববন্ধুর সেটা ভারী ভালো লেগেছে, বোধ হয় তার ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে। Brindisiতে শুনছি ৮৫জন লোক উঠছে— আমাদের cabinএ আর দুটো berth আছে, সে দুটোতেও লোক আসছে। শুনে অবধি বিষম চিন্তিত হয়ে আছি। Connollyর সঙ্গে যেমন বনে গেছে এমন বোধ হয় কারও সঙ্গে সম্ভাবনা নেই। এক রকমে ভালো— এই রকম করে experience লাভ হয়। যে মেয়েকে আমার বেশ লাগে তার নাম Miss Long। সে Indiaতে বিয়ে করতে যাচ্ছে, একজন কার

সঙ্গে engaged। তিন Australian বোনকে মন্দ লাগছে না— তার প্রধান কারণ, আমাকে তারা বিশেষ করে বেছে নিয়েছে, এবং মন্দ দেখতে না, এবং বেশ piano বাজায়। সেদিন একটা সুর বাজাচ্ছিল আমার খুব পরিচিত, যেটা নিয়ে Park Stএ থাকতে প্রায় parody করতুম— বোধ হয় কী-একটা *Cavatina* কিম্বা *Estudiantina* কিম্বা *Dames de Seville* কিম্বা ঐরকম একটা বিদিগিচ্ছি ব্যাপার। কিন্তু পরিচিত বলেই আমার ভারী ভালো লাগল। Australian মেয়েদের নাম Misses Bayne।

আমি মজা দেখেছি, অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ তাদের স্বদেশী সুন্দরীদের ছেড়ে এই অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের সঙ্গলালসায় ব্যস্ত। সকলেই বলে : They are very nice। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কেন বল দেখি। তারা বলে : They are so unaffected, childlike, they are not at all *smart*। বাস্তবিক ইংরেজ অল্পবয়সী মেয়েরা বড্ড বেশি smart। বড্ড চোখ মুখ নাড়া, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব। কারও কারও হয়তো লাগে ভালো, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে একান্ত শ্রান্তিজনক। মেয়েদের বেশ unaffected simplicity এবং earnestness দেখলে বেশ একটু আরাম পাওয়া যায়, যথার্থ স্থায়ী সুখ অনুভব করা যায়।

বৃহস্পতিবার [১৬ অক্টোবর]। মেজদাদা আর লোকেনকে চিঠি লিখলুম— চিঠির কাগজ সঙ্গে ছিল না, কনলির কাছে ধার করতে হল। লেখা শেষ করে টেবিল থেকে উঠবার সময় টেবিলের চাদরে টান প'ড়ে দোয়াত চিঠি সমস্ত নীচে পড়ে গেল— চিঠির উপরে এবং চতুর্দিকে কালী ছিটকে পড়ল— অস্থির কাণ্ড! আমার মতো যথার্থ clumsy লোক দুনিয়ায় নেই।

উপরে গিয়ে বেড়াচ্ছিলুম, একজন অস্‌ট্রেলিয়ান মেয়ে আমার সঙ্গ নিলে। আমি দেখেছি এ রকম মেশামেশি বেশিক্ষণ আমি সইতে পারি নে। আজ সন্ধের সময় সুন্দরীর সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্তা কয়ে এমনি শ্রান্তি এবং বিরক্তি বোধ হতে লাগল, যে, কোনো ছুতোয় পালাতে পারলে বাঁচি এমনি মনে হল। সৌন্দর্য দেখতে এবং কল্পনা করতে বেশ লাগে, কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে পায়চারি করে small talk করতে আদবে ভালো লাগে না। আমি মনে মনে মেয়েদের এত ভালোবাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারি নে— আশ্চয্যি! আমার আপনা-আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব হবে না। আজ এদের অভিনয় হয়ে গেল। আমার সেই সুন্দরী বন্ধু চমৎকার অভিনয় করেছিল, তাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে আমার সঙ্গে এমন এক রকম করুণ মমতার সঙ্গে কথা কয়, এমন এক রকম পূর্ণ ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে মুখের দিকে চায়, আমার বেশ লাগে— যদিও তার সঙ্গে যে বেশি মিশি তা নয়। আজ রাত্তিরেও আমাকে গান গাইতে হল। তার পরে নিরালায় অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারী মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে ততই আবিষ্কার করছি আমি বাস্তবিক আন্তরিক দিশি, বাঙালী, ঘোরো, কুনো, সেকেলে, শ্রান্ত, অকর্মণ্য— এখনকার লোক অতি শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে— আমি আমার জনশূন্য কোণে চিরকাল মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। অনেক রাত হয়ে গেছে।

যে দুটো নাটক অভিনয় হয়ে গেল তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে *Our Bitterest Foe*— দ্বিতীয়টা *Fast Friends*। প্রথমটা

ভালো রকম দেখতে শুনতে পাই নি— একজন দূরস্থিত লেডিকে আমার চৌকি ছেড়ে দিয়েছিলুম। প্রথমটা নেহাত অসম্ভব-রকম sentimental, বিশেষ কিছু নয়। দ্বিতীয়টা ভারী মজার, আর বেশ অভিনয় হয়েছিল। ছবি-আঁকা programmeগুলো বেশ করেছিল।

আজ একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে Christianityর অনেক প্রশংসা করে বলছিল, আশ্চর্য দেখেছি তোমাদের মধ্যে যদিও খৃস্টানধর্ম প্রচলিত নেই তবু তোমাদের নিম্নশ্রেণীয় লোকেরাও এমন gentle এবং refined! ইংরেজ ছোটোলোকেরা আস্ত brute। তার থেকে আমি Anglo-Indianদের কথা তুলে আমার মনের সাধ মিটিয়ে কতকগুলো কথা বলে নিলুম। আমার ইচ্ছে আমাদের আমাদের টেবিলের সুন্দরীকে এ সম্বন্ধে একবার ভালো করে বলব— আগে তাকে মিষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বশ করে আনা যাক। কাল তাকে এক প্যাকেট butterscotch দিয়েছি। আমি যে ভালো রকম করে মেয়েদের সাহচর্য করতে পারি নে— সে আমাকে অনেক অবসর দিয়েছিল।

শুক্রবার [১৭ অক্টোবর]। আজ সকালে আর-একজন Anglo-Indianএর সঙ্গে কথা হল, তাকেও মনের সাধে অনেক কথা বলেছি। সে Northwestএর কোন্-এক জায়গার ম্যাজিস্ট্রেট। সে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলে; সে বললে, ভারতবর্ষীয়দের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করলে তারা ভারী বাধ্য হয়। আজ বিকেলে Maltaয় জাহাজ পৌঁছবে— নাবব না মনে করছি। জাহাজে একলা বসে আরামে পড়ব। হাতে টাকা থাকলে এখান থেকে বাড়ির জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেতুম। এখনো বম্বে পৌঁছতে দিন পনেরো-ষোলো লাগবে—এক-এক সময়ে মনের মধ্যে এমন ছেলেমানুষ ঘর

মত অধৈর্য উপস্থিত হয়! আমার নিজেকে আলোচনা করলে আমার নিজের হাসি পায়। আমার অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু আজ প্রায় সমস্ত দিন আমার সঙ্গে আছে, আমাকে আজ পড়তে দিলে না। বিকেলের দিকে Malta দেখা দিলে— কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত শহর, দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের এইখেনে নেবে যাবার কথা। অনেক লোক এইখেনে নাববে। তাই জিনিসপত্র তোলা নিয়ে বিষম হট্টগোল বেধে গেছে। আমি মাল্টা দেখতে যাব না শুনে আমার অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবী ভারী পীড়াপীড়ি করছে। আমার নববন্ধু Gibbsকে বলছিল: Do induce him to come on shore, then we shall meet again at the Grand Hotel। শেষকালে রাজি হলুম। Gibbsএ আমাতে মিলে বেরোনো গেল। সমুদ্রের ধার থেকে সুরঙ্গপথের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে— সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে শহরে উঠলুম। চার দিক থেকে guideএর দল ছেঁকে ধরলে। Gibbs তাদের তাড়িয়ে দিলে। একজন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লে না— সে যত আমাদের এটা ওটা দেখায়, পথ বাৎলে দেয়, Gibbs ততই বলতে থাকে: Don't want your service— Won't pay you। সে যে দিকে যেতে বলে তার উলটো দিকে যায়। কিন্তু তবু সে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল— তার পরে যখন তাকে নিতান্ত তাড়িয়ে দিলে তখন সে চলে গেল। আমার ভারী মায়া করছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে পাউন্ড্ ছাড়া কিছুই ছিল না। Gibbs বললে, আমি ওকে এক ফার্দিংও দেব না— কোনো Englishman হলে প্রথমবার বললেই চলে যেত। Gibbs মহা চটে গেল— আমার ভারী মায়া করতে লাগল। ইংরেজে বাঙালীতে এমনি জাতীয়

প্রভেদ। অথচ বুঝতে পারছি কেন সে চটছে। আমি দেখছি লোকটার আচরণ যেমনি হোক-না কেন, বড্ড গরিব এবং বড়ো আশা করে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। Gibbs বলছে : He must be very hard up to follow us thus but no Englishman would do it। তার আচরণ এত খারাপ লাগল যে তার দারিদ্র্য দেখে দয়া হল না। বেশ বোঝা যায় একজন ইংরেজ ভারতবর্ষে গিয়ে আমাদের দিশি লোকের প্রতি ক্রমে ক্রমে কিরকম করে চটে যায়— বিলিতি নিয়মানুসারে যেগুলো ত্রুটি সেইগুলো এত দিক থেকে এত চোখে পড়ে যে, আমাদের জাতির যেগুলো বিশেষ গুণ সেগুলো তারা দেখতে পায় না। বিলিতি দোষ দেখলে তারা এত আপত্তি করত না, কিন্তু অপরিচিত দোষ তাদের অসহ্য বোধ হয়। শহরটা নতুন রকমের। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা— একবার পাহাড়ের উপরে উঠছে একবার নীচে নাবছে— বিশ্রী গন্ধ— গোলমাল— কী এক রকমের। একটা Roman Catholic Churchএর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলুম— প্রকাণ্ড ঘর, চারি দিকে খৃস্ট এবং সেণ্ট্দের মূর্তি, বেদীর সামনে বাতি জ্বলছে ; এক রকম গাম্ভীর্যজনক অন্ধকার, ঘর গম্ গম্ করছে, বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়ে পুরুষে গুন্ গুন্ স্বরে স্তব পাঠ করছে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে মনকে যেন কী এক রকম oppress করতে থাকে। এখানকার মেয়েদের শিরোভূষা অদ্ভুত রকমের, গাড়ির hoodএর মতো এক রকম overhanging ঘোমটা। খুব ছোটো ছোটো মেয়েদের বেশ দেখতে— জ্বল্‌জ্বলে কালো চোখ— দেখে বেলিকে মনে পড়ছিল— কিন্তু একটিও ভালো দেখতে বড়ো মেয়ে দেখলুম না। পথে যেতে যেতে Australian বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বললে : Grand Hotelএ এসে dinner কোরো, তা হলে আর-

একবার দেখা হবে। একটা দোকানে গিয়ে গলার গয়না এবং রুপোর brooch কেনা গেল। Gibbsএর চিঠি post করবার ছিল, তাই post officeএ যাওয়া গেল। একটি সুন্দর দেখতে ইংরেজ মেয়ে টিকিট বিক্রি করছে, Gibbs তার সঙ্গে খানিক ক্ষণ কথাবার্তা কইলে; বেরিয়ে এসে বলছে: Isn't she awfully nice looking? Grand Hotelএ এসে তার মনে পড়ল একটা পার্শেল পোস্ট্ করবার আছে, মনে পড়তেই হুর্‌রে ব'লে নাচ আরম্ভ করে দিলে— আমরা তখন নাবার ঘরে: So I am going to have another chance of seeing her। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টে সে chance জুটল না। ফিরে গিয়ে দেখা গেল post office বন্ধ। Hotelএ গিয়ে দেখি আমাদের জাহাজের বিল্‌কুল লোক সেখেনে জুটেছে, জাহাজের ডিনার-টেবিলের সঙ্গে কোনো তফাত নেই। কিন্তু অতি যাচ্ছেতাই খেতে দিলে— বদ গন্ধ, বদ জিনিস, অল্প পরিমাণ, বেশি দাম। আমি তো আর্ধেক জিনিস মুখে দিয়ে ফেলে দিলুম। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। Government Houseএর সামনে একটা বড়ো বাঁধানো square আছে— সেইখানে সন্ধের সময় লোকসমাগম হয়, band বাজে। সেইখানে আমরা জুটলুম। পরিষ্কার রাত্রি, কিছুমাত্র শীত নেই, সুন্দর band বাজছে— বেশ লাগছিল। চার দিকে বাগান থাকত তো আরও ভালো হত। এ কেবল একটা প্রকাণ্ড বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো। এক দিকে Government House, এক দিকে Grand Hotel, এক দিকে রক্ষকশালা, আর-এক দিকে কী মনে পড়ছে না। রাত যখন দশটা বাজে তখন জাহাজ-অভিমুখে ফেরা গেল— দুই-এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে, দুই-এক জায়গায় উঁচু রাস্তা দিয়ে উঠে, নিচু রাস্তা দিয়ে নেমে, সমুদ্রতীরে পৌঁছে

নৌকো নিয়ে জাহাজে যাওয়া গেল। পথের মধ্যে একদল পথপ্রদর্শক আমাদের টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছিল— Gibbs দুজন সৈন্য ডেকে তাদের তাড়িয়ে দিলে এবং সৈন্য দুজন আমাদের বরাবর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। নৌকোওয়ালা বললে, ১৮ পেনির কমে যাব না। Gibbs নাছোড়বান্দা— P & O Officeএ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কত ভাড়া। তারা বললে, যদি P & O Passenger হও তা হলে ৪ পেনি দিতে হবে। ব'লে সে নিজে এসে আমাদের নৌকোয় তুলে দিলে। Gibbs ভারী রাগান্বিত যে বিদেশী দেখে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা। কাজেই আমাকে গল্প করতে হল একজন লন্ডন-গাড়িওয়ালা কী করে আমাদের কাছে পাঁচ শিলিঙের জায়গায় আঠারো শিলিং নিয়েছিল। সে সম্বন্ধে সে কোনো উত্তর করলে না। বোধ হয় বা বিশ্বাস করে নি।

শনিবার [১৮ অক্টোবর]। আজ সমস্ত সকাল Gibbsএর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে একজন bankএর কর্মচারী। সে বলছিল, তুমি কল্পনা করতে পারো না young clerkরা কী জঘন্য কথাবার্তা এবং গল্প করে! বললে, ইংলন্ডে smutty talk সর্বত্র প্রচলিত। এমন-কি, মেয়েদের মধ্যেও। সে যা বললে শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। সে বললে sober এবং decent fellowদের বিষম মুশকিল, সর্বদা এমন দলে মিশে থাকতে হয় যে সে অতি ভয়ানক। সে বলে, আমরা নিতান্ত hypocrite জাত— বাইরে ভারী respectable, ফরাসি নভেলের নিন্দে করে থাকি, কিন্তু সর্বদা যে রকম কথাবার্তা এবং আমোদপ্রমোদ চলে সে আর বলবার বিষয় নয়। আমি বেশ বুঝতে পারলুম আমাদের দিশি যারা বিলেতে যায় তারা কোথা থেকে বদ্ কথা এবং জঘন্য গল্প শিখে আসে। আমাদের lunchএর পরে মেয়েরা উঠে গেলে টেবিলে Bayleyর সঙ্গে Gibbsএর

লন্‌ডনের city-অঞ্চলে কিরকম কাণ্ড চলে তাই গল্প চলছিল। Bayley বলছিল : I am sorry to say আমার young daysএ আমিও অনেক কাণ্ড করেছি। ইত্যাদি। Gibbs লোকটাকে বেড়ে লাগছে— মদ খায় না, gamblingএ যোগ দেয় না, মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা রহস্যালাপ করে না, অথচ কড়া ধার্মিকতা বা গোঁড়া ক্রিশ্চানি কিছুমাত্র নেই। বেশ সচরাচর ভদ্রলোকের স্বভাবতঃ যেমন হওয়া উচিত সেই রকম। তার একটা আচরণ আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছিল— কাল post officeএর সেই মেয়ের সঙ্গে কেমন বেশ সহজ ভদ্র ভাবে কথাবার্তা কইলে। লোকেনরা যেমন দোকানদার সুন্দরীদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করে Gibbsএর আচরণে তার লেশমাত্র ছিল না। সৌন্দর্যের প্রতি এই রকম সসম্মান আনন্দের ভাব আমার ভারী ভালো লেগেছিল— এ লোকটার সঙ্গে আমার ঠিক মনের মিল হয়েছে। এর সঙ্গে সমস্ত ক্ষণ গল্প করতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। Conolly বোধ হয় ভারতবর্ষে গিয়ে দেখতে দেখতে বদলে যাবে। এরই মধ্যে সে একটা দলের মধ্যে পড়ে কেবল তাস খেলছে, চুরোট খাচ্ছে, gamble করছে— একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরছে। Gibbs বলছিল সকলে মিলে Conollyর মাথা খাচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে smugglingএর গল্প হচ্ছিল। কে কখন কী কৌশলে কত smuggle করেছিল তাই নিয়ে জাঁক করছিল। Mrs Smallwood একবার ইংলন্‌ডের custom houseকে ফাঁকি দিয়েছিল শুনে Bayley বলছিল : Don't you think that was wrong? Mrs Smallwood বললে : No, I am proud of it। এ রকম জুয়াচুরিতে এদের conscience কিম্বা সত্যপ্রিয়তায় আঘাত লাগে না। এরা বুঝতে পারে না এক-এক জাতের এক-

এক বিষয়ে নীতিজ্ঞানের জ ো থাকে। কৌশলে মিথ্যাচরণপূর্বক smuggle করা সম্বন্ধে ইংরেজদের এখনো ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক হয় নি ; কিন্তু তার থেকে কেউ যদি মনে করে, তবে ইংরেজরা মিথ্যাচারী এবং জোচ্চোর, তা হলেই ভুল করা হয়। আমাদের জাতের দোষ-গুণ সম্বন্ধে যখন ইংরেজরা generalize করে তখন এইটে তারা ভুলে যায়।

Miss Hedistedকে আজ সেদিনকার পাখাওয়ালা সম্বন্ধে বলেছি। সে বললে, ভারতবর্ষে অনেক cads যায় যারা এই রকম করে— ভা ি ন্যায়— ইত্যাদি। যা হোক, ব'লে মন খোলসা হল। Miss Long যখন কথা কয়, হাসে, এমন চমৎকার দেখতে হয়— আমার দেখতে ভারী ভালো লাগে— যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি intellectual মুখের ভাব।

রবিবার [১৯ অক্টোবর]। আজ ভোরে Brindisiতে পৌঁছনো গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এক-দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্‌ বেয়ালা ম্যান্‌ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে এবং একটা ছোটো ছেলে গান গাচ্ছে— বেশ লাগছে। বৃষ্টির জন্যে নাবতে পারলুম না। আমার ডেক্‌চৌকি পিয়ানো আপিসে পড়ে আছে। আজ বিকেলে বোধ হয় চিঠি পাওয়া যাবে।— বৃষ্টি থেমে গেছে। Gibbs আমাকে টানাটানি করে ডাঙায় নিয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলুম একটা উঁচু জমির উপর কতকগুলো ভাঙা পাথরের সিঁড়ি উঠেছে, উপরে উঠে একটা পুরোনো গির্জা পাওয়া গেল। ভিতরে গিয়ে দেখলুম নানা রকম টুকিটাকি দিয়ে সাজানো— খুব গরিব রকমের ব্যাপার। বেদীর এক জায়গা থেকে একটা পর্দা উঠিয়ে দেখালে ক্রাইস্টের মোমের প্রতিমূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে— সর্বাঙ্গ ক্ষত-

বিক্ষত, রক্ত ঝরে পড়ছে। অতি ভয়ানক— এমনতর realistic কাণ্ড কখনো দেখি নি। সেখেন থেকে বেরিয়ে একটা উঁচু রাস্তা ধরে শহরের বাইরে গিয়ে পড়লুম— দুই ধারে cactus-বেড়া-দেওয়া শস্যক্ষেত্র এবং ফলের বাগান। একটা ফলের বাগানে ঢুকে পড়া গেল। আঙুরের লতাকুঞ্জে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। এক রকম গোলাপী আঙুর চমৎকার দেখতে— এক রকম সরু সরু লম্বা আঙুর, ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে— কেবল দুই ধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে fig গাছে দুটো ছোকরা ফিগ পেড়ে পেড়ে খাচ্ছিল— আমাদের চেঁচিয়ে ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে আমরা fig খাব কিনা। আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি, তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ-শাখা নিয়ে এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে? আমরা বললুম, না। তার পরে ইশারায় জানিয়ে দিলে যে, খানিকটা তামাক পেলে তারা বড়ো খুশি হয়। Gibbs তাদের খানিকটা তামাক দিলে। তার পরে বরাবর তারা আমাদের সঙ্গে চলল— প্রবল অঙ্গভঙ্গী-দ্বারা উভয়পক্ষ মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা পাহাড়ে জমির ও ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলেছে — কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছোটো বাড়ি এবং এক-এক জায়গায় শাখাপথ নীচের দিকে নেবে বক্রগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢুকলুম। এদের গোর নতুন রকমের। গোরের উপরে এক-একটা ঘরের মতো— পর্দা দিয়ে, রঙিন জিনিস দিয়ে নানা রকমে সাজানো— একটা বেদীর উপরে অনেকগুলো শামাদানের উপর বাতি লাগানো রয়েছে এবং সাধুদের অথবা কুমারীর প্রতিমূর্তি। কোনো কোনো

ঘরে মৃতব্যক্তির প্রতিমূর্তি আছে। বোধ হয় আত্মীয়েরা এসে নানা রকম করে সাজিয়ে-গুজিয়ে যায়। এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে নেবে মাটির নিচেকার একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম স্তূপাকারে অসংখ্য মড়ার মাথা সাজানো রয়েছে, বোধ হয় পুরোনো গোর থেকে তুলে ঐরকম করে রেখে দিয়েছে— কত বৎসরের কত সুখদুঃখের এই একমাত্র অবশেষ। ঐ বাক্যহীন, দৃষ্টিহীন, চিন্তাহীন নিশ্চল ভীষণ স্তূপের মধ্যে হয়তো এমন অনেক মাথা আছে জীবিত অবস্থায় যার স্পর্শলাভ করলে অনেক হতভাগ্য কৃতার্থ হয়ে যেত। দৈবাৎ হয়তো তাদের দুটো মাথা পরস্পর পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে— এখন কি ঐ অন্ধকার নেত্রকোটর দিয়ে তারা পরস্পরকে চিনতে পারছে। হায়, যে স্পর্শসুখ এক কালে এক মুহূর্তের জন্যে বহুমূল্যবান ছিল এখন তা চিরদিনের জন্যে নিষ্ফল। উঃ— ঐ মাথাগুলোর ভিতরে কত চিন্তা কত স্মৃতি সঞ্চিত ছিল, কত দুরাশা ওর মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল— ওদের মধ্যে থেকে যে-সকল চেষ্টা যে-সকল কার্য উদ্ভূত হয়েছিল তারা এখনো এই পৃথিবীর কত দিকে কত আকারে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের চিরধাবিত বিচিত্র গতি কেউ বন্ধ করে দিতে পারে না— কেবল ওরাই চিররাত্রিদিনের মতো নিশ্চল নিশ্চেষ্ট নির্জীব সৌন্দর্য-লেশবিহীন। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম মনুষ্যলোকের উপরে যেন একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে— আস্তে আস্তে পর্দা তুলে দেখো, ভিতরে লাবণ্যবিহীন অস্থিকঙ্কাল, জ্যোতির্হীন চক্ষুকোটর, এবং বুদ্ধিবিহীন কপালফলক। হঠাৎ যদি কোনো নিষ্ঠুর শক্তি নর-সংসার থেকে এই যবনিকা উঠিয়ে ফেলে তা হলে সহসা দেখা যায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই চুম্বনমধুর আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি কী বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে! পুরোনো বিষয়, পুরোনো কথা— ঐ নরকপাল অবলম্বন করে অনেক নীতিজ্ঞ পণ্ডিত

অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছে। কিন্তু আমি যখন দাঁড়িয়ে দেখলুম এবং ভালো করে ভাবলুম আজ আমার এই-যে মাথা ভাবছে এবং ভালোবাসছে কিছুদিন পরে সংসারের ঐ চিরবিস্মৃত অসীম স্তূপের মত ভুক্ত হতে পারে, তখন মনের মধ্যে এক রকম বিষণ্ণ বৈরাগ্য উদয় হল বটে, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় হল না। ভাবলুম আর যাই হোক, ঐ সহস্র সহস্র মাথা অনিদ্রা দুশ্চিন্তা দুশ্চেষ্টা দুরাশা থেকে চিরদিনের মতো আরোগ্য লাভ করেছে। তার সঙ্গে এও ভাবলুম, Rowlandএর ম্যাকাসার অয়েল পৃথিবীতে প্রতিদিন শিশি ভরে ভরে বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু কোনোকালে এদের তার এক ফোঁটা আবশ্যক হবে না— এবং দন্তমার্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করুক-না কেন, এই অসংখ্য অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নেবে না।— শেষোক্ত চিন্তাটা প্রসঙ্গের উপযোগী গম্ভীর নয়, কিন্তু আমাদের চিন্তারাজ্যে জাতিভেদ এবং পৃথক আসনের প্রথা নেই। আমরা লেখবার সময়ে অনেক বিচার করে নির্বাচন করে লিখি, কিন্তু ভাববার সময় হযবরল করে ভাবি। আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে তর্ক করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে অনেক ক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি, এবং যখন পিঠের ঠিক মাঝখানটা চুলকোচ্ছে এবং কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি নে তখন প্রেয়সীর ভুবনমোহিনী মূর্তি মনে উদয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক্‌গে, আপাততঃ আমার এই মাথার খুলিটার মধ্যে চিঠির প্রত্যাশা বিজ্‌বিজ্‌ করছে— যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলির মধ্যে খুব খানিকটা খুশির উদয় হবে, যদি না পাওয়া যায় তা হলে ঐ অস্থিগহ্বরের মধ্যে আজকের দিনের মতো দুঃখ-নামক ভাবের সঞ্চার হবে, ঠিক মনে হবে আমি ভারী কষ্ট পাচ্ছি। এই মাথাটার পক্ষে গোটাকতক কথা-অঙ্কিত পত্রখণ্ডের কী এমন

গুরুতর আবশ্যক কিছু বোঝবার যো নেই। আজ চিঠি না পাওয়ার দরুন সেদিনকার মহানিদ্রার কি কিছু ব্যাঘাত ঘটবে? সেদিন ইচ্ছানিরপেক্ষ যে চিরবিশ্রাম জুটবে আজ তার ছায়ামাত্র পেলে বেঁচে যাই। 'মরণ হলে ঘুমিয়ে বাঁচি' কথাটার মধ্যে মানবজীবনের অনেক বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এই fever of lifeএ দীর্ঘ রাত্রিদিন কেবল এপাশ ওপাশ করা যাচ্ছে— ঘুম আর আসে না।

রাত্রি সাড়ে-দশটা পর্যন্ত চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে জানতে পারলুম চিঠি পাওয়া যাবে না। চিঠি আমার পিছনে পিছনে কলকাতায় যাত্রা করবে। দূর হোক্‌গে, শুতে যাওয়া যাক্। ঘুম আসছে, এমন সময় লোকেন আর সল্লির চিঠি পেলুম। টফি লেগে সল্লির চিঠির অর্ধেক পড়া গেল না। লোকেন লিখছে ছোটো বউয়ের চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু পেলুম না।

সোমবার [২০ অক্‌টোবর]। সমস্ত দিন seasick— অসহ্য যন্ত্রণা। কিচ্ছু খাই নি।

মঙ্গল [২১ অক্‌টোবর]। উঠে একটু breakfast করেছি, আজ ভালো বোধ হচ্ছে। আমি আমার কোণে চুপ করে বসে থাকি— Miss Long যতবার আমার সমুখ দিয়ে চলে যায় আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে যায়, আমিও হাসি; মনে হয় এর পরে উঠে গিয়ে তার সঙ্গে একটু আলাপ না করা rude হয়ে পড়ছে, কিন্তু কিছুতে হয়ে ওঠে না। আজ সন্ধের সময় পাশে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বললুম। বললুম : It was unkind of you Miss Long to look so aggressively well yesterday while we were all so miserable। Miss Long বললে : I was awfully sorry for you, you looked so bad। তার পরে অনেক গল্প হল। আজ সন্ধের সময় আবার এক-চোট নৃত্য হয়ে

গেল। Miss Vivianএর সঙ্গে আমি গল্প করছিলুম; সে বলছিল: It always seemed to me something weird, this dancing on board a steamer। আমি বললুম: Yes, it is so out of harmony with the surroundings, with the beautiful, peaceful moonlight night yonder ইত্যাদি। Miss Vivian বেশ প্রশান্ত মৃদুস্বভাব মেয়ে— বেশ মেয়েলি রকমের পড়াশুনো ভালোবাসে, আমার সঙ্গে কবিতা নিয়ে অনেক কথা হল। সে দুই-একজন কবিমেয়েকে জানে: It is a great gift, but poets are not a happy lot। আমি বললুম: To be sure, they are not। সে জানে না আমি সেই হতভাগ্য gifted দলের একজন। Mrs Goodchild আমাকে বলছিল: I have heard you have got a very clever sister। বোধ হয় বাবিকে মনে করে বলছিল। Gibbs নাচতে ভালোবাসে না, যদিও তার বয়স ২১ মাত্র— সেইজন্যে তাকে আমার আরও ভালো লাগে। আজ বেশ জ্যোৎস্না রাত্তির হয়েছে।

বুধ [২২ অক্টোবর]। ক্রমেই গরম বাড়ছে। আজ লোকেনকে চিঠি লিখ্লুম। মাঝে একবার Miss Long এসে তার birthday bookএ আমার নাম লিখিয়ে নিয়ে গেল। একজন লেডির প্রতি একজন যুবক যে রকম ব্যবহার করে Gibbs আমার প্রতি অনেকটা সেই রকম ব্যবহার করে। আমার গ্লাসে জল ঢেলে দেয়, ডিনার-টেবিলে আমাকে নানাবিধ খাবার জোগায়, ছোটো-খাটো নানা বিষয়ে আমার সাহায্য করে— অনেক সময়ে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। বোধ হয় আমার মধ্যে সে এক রকম অকর্মণ্য অসহায় মৃদুভাব দেখতে পায়, যাতে করে তার স্বাভাবিক পৌরুষিক স্নেহ উদ্রেক করে।

Mrs Fraser আমাকে tea partyতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি Browning পড়ছিলুম দেখে সে ভারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে : Are you not one of the Tagores ? আমি বললুম, হাঁ। সে বললে, তোমার sisteiকে কোন্‌-এক পার্টিতে দেখেছিলুম, তোমার মুখ দেখেই তার সঙ্গে সাদৃশ্য টের পেয়েছিলুম— My name is Schiller। ইত্যাদি।

সমুদ্রে চন্দ্রোদয় দেখলে মনের মধ্যে এমন একটা বৈরাগ্য, এমন একটা ঔদাস্য এনে দেয়! এই অসীম সমুদ্র এই অনন্ত রাত্রির এক ধারে একটুখানি আলো, একটুখানি ঝিকিমিকি। মনে হয় আমাদের জীবন এই রকমের— অসীম সংশয়ের মধ্যে একটুখানি বিষণ্ণ দিশাহারা আলোকরেখা, বাঁচবে কি মরবে কিছু ঠিকানা নেই। ঐ সমুদ্রের পরপারে আস্তে আস্তে নিবে যাবে, অসীম জলরাশি গম্ভীর মৃত্যুর গান গাবে— তার পরে আবার আঁধার রাত্রি। মনে হয় আমাদের জীবন প্রকৃতির আভ্যন্তরিক কোন্‌-এক শক্তির ক্ষণিক চেষ্টা, ক্ষণিক উত্থান ; থেকে থেকে অবিশ্রাম মাথা তুলে উঠছে, কিন্তু চার দিক থেকে অসীম জড় এবং অসীম মৃত্যু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে নির্বাপিত করে দিচ্ছে। বহু চেষ্টায় প্রকৃতি যেমনি আপন অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে পুষ্প-আকারে বিকশিত করে তুলছে অমনি দেখতে দেখতে মাটি তাকে টেনে মাটি করে দিচ্ছে। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু জীবনের তুলনায় এই চিরস্থায়ী চিরনীরব মৃত্যু এই সর্বব্যাপী জড়ত্বের অবিশ্রাম অলক্ষ্য মাধ্যাকর্ষণ কী প্রবল! যেমনি জীবন শ্রান্ত হয়ে আসে, যেমনি চেষ্টা একটু শিথিল হয়ে আসে, অমনি ঝরে যেতে হয়, পড়ে যেতে হয়— তখনি

হুহু করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে যেতে হয় অনন্ত ইহজগতে তার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই রকম করে মহারাক্ষস মৃত্যু জীবন গ্রাস করে করে চিরদিন বেঁচে রয়েছে। মিছে কেন তর্কবিতর্ক মতামত সন্দেহবিচার! এই ক্ষণিক সূর্যালোকে আমাদের দুদণ্ডের হাসিগল্প মেলামেশা, পরস্পরের প্রতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা— চন্দ্রোদয়, ফুল-ফোটা বসন্তের বাতাস, দুদিনের মোহ সমাপন করে নেওয়া যাক্— যবনিকার অন্তরালে মৃত্যু প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কোন্ অসম্ভব সুখ কোন্ দুর্লভ ভালোবাসার জন্যে চিরদিন নির্বোধের মতো অপেক্ষা করে বসে আছি— আমাদের কি অপেক্ষা করবার সময় আছে! যা হাতের কাছে আসে তাই নিয়ে প্রসন্নচিত্তে কাটিয়ে দেওয়া যাক— তাড়াতাড়ি করে জীবনকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। তুমি দৈবক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছ, এসো— তুমি আমার ভালোবাসা চাও না, যাও, আপন পথে যাও— জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই— বিলাপ করবার অবসর নেই— সুখ দুঃখ হিসাব করবার আবশ্যক নেই। যা পাব না প্রসন্নচিত্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাক।

জাহাজের রেলিং ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে এই রকম করে আপনার জীবন সমালোচনা করছিলুম, এমন সময় একজন এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেউ হও কি? আমি বললুম বিশেষ কেউ নয়, তাঁর ভাইমাত্র। এও সিভিলিয়ান। ৮৬ সালে তাঁর হয়ে সোলাপুরে একটিন ছিল, বাবিকে জানে। Brandকে জানে— বেশ পিয়ানো বাজাতে পারে, ভারী কুনো। Mrs Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs Moeller বললে: It is a

treat to hear you sing। Webb এসে বললে: What would we do without you Tagore— there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনোটাই tenor pitchএ ছিল না, তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitchএর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

কাল Miss Longকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, এই কি তোমার প্রথম ভারতযাত্রা? সে একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে খুব জোর দিয়ে বললে: Do you know Mr Tagore, I am a born Anglo-Indian! আমি কিনা অনেক লোকের কাছে অনেকবার Anglo-Indianদের সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করেছি, বোধ হয় শুনেছে। Miss Long পুনায় যাচ্ছে।

রাত দুটোর সময় জাহাজ পোর্ট্ সৈয়েদে পৌঁছল, Gibbs আমাকে নাববার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করলে, আমি নাবলুম না। আমার ক্যাবিনের অন্য দুজন নেবেছিল।

বৃহস্পতিবার [২৩ অক্টোবর]। এখন সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমাদের যাত্রার আরও এগারো দিন বাকি আছে। এগারোটা দিন আসলে কত অল্প, কিন্তু কী অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

চমৎকার লাগছে। উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। এক রকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্মৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদীকলধ্বনিসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার

ভালোবাসা-লালায়িত কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে এই তপ্তবায়ু-হিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার স্বপ্নভারনত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠছে। আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাংলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে— আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনকসূর্যাস্তরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ডচেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন এবং যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও— আমি জগদ্‌বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত এবং অপর্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাই নে।

Schiller একজন জর্মান সহযাত্রী আমাকে বলছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা করো তা হলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে: You have a mine of wealth in your voice। প্রথম বারে যখন ইংলন্ডে ছিলুম তখন যদি এই কাজ করতুম তা হলে মন্দ হত না। আর কিছু না হোক নিদেন পক্ষে হয়তো একটা উপার্জনের পন্থা থাকত।

ডেকে বসে খানিকটা Alphonse Daudet পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম— দু ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাস্তূপ, জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে— আমাদের দক্ষিণে সেই বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়ে এক দল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে— প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগড়ি ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেউ বা বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে

টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একটু-খানি ছবির মতো মনে হল।

জাহাজ মাঝে একবার তলায় আটকে গিয়েছিল। অনেক হাঙ্গাম করে ঠেলে বের করেছে।

শুক্রবার [২৪ অক্টোবর]। Mrs Smallwoodকে আমাদের ডিনার-টেবিলে দেখে অনেক সময় ভাবি— যে-সব মেয়ের বয়স হয়েছে, যাদের গৌরবের দিন চলে গেছে, তাদের মনের অবস্থা কিরকম? এই Smallwood খুব প্রখর মেয়ে— এক কালে বোধ হয় অনেকের উপর অনেক খরতর শরচালনা করেছে— অনেক পুরুষ এর রুমাল কুড়িয়ে দিয়েছে, মিষ্টিকথা বলেছে, নেচেছে, বিবিধ উপায়ে সেবা এবং পূজা করেছে— এখন আর কেউ গল্প করবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় পরিবেশন করে না — যদিও সে নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুরীশালিনী এবং তার প্রখরতাও বড়ো সামান্য নয়। অবিশ্যি, বয়স অল্পে অল্পে এগোয় এবং অনাদর ক্রমে ক্রমে সয়ে আসে। কিন্তু তবু যে-সব মেয়ে চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে নি, গৃহকার্য অবহেলা করেছে, ছেলেদের দাসীর হাতে সমর্পণ করে রাত্রির পর রাত্রি নৃত্যসুখে কাটিয়েছে, উগ্র উত্তেজনায় মত্ত হয়ে জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীততৃষ্ণ হয়েছে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কী শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না— তারা অল্পে অল্পে স্ত্রী থেকে মা এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে, পূর্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই। এক দিকে Mrs Smallwoodকে এবং অন্য দিকে Miss Low এবং

Miss Hedistedকে দেখি— কী তফাত! তারা অবিশ্রাম পুরুষ-সমাজে কী খেলাই খেলাচ্ছে! আর কোনো কাজ নেই, আর কোনো ভাবনা নেই, আর কোনো সুখ নেই— সচেতন পুত্তলিকা— মন নেই, আত্মা নেই— কেবল চোখে মুখে হাসি এবং কথা এবং তীব্র উত্তর-প্রত্যুত্তর। এক-এক দিন সন্ধেবেলা যখন সমস্ত পুরুষ আপন আপন চুরোট এবং তাস নিয়ে স্বজাতিসমাজে জটলা করে— তখন Miss Hedisted কী ম্লান বেকার ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয় যেন আপন সঙ্গহীন অবস্থায় আপনি পরম লজ্জিত। এক-এক দিন সেই রকম অবস্থায় আমি গিয়ে তাকে কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল করে তুলি। সেদিন নাচের সময় Miss Vivianএর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, তোমরা পুরুষ ball roomএর এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু মনে হয় না; কিন্তু মেয়েদের wall flower হয়ে থাকা দুরবস্থার একশেষ, ভারী লজ্জা এবং নৈরাশ্য উদয় হয়।— এই-সব দেখে আমার মনে হয় আমাদের পুরুষদের জীবনে যা-কিছু সুখ আছে তার স্থায়িত্ব এবং গভীরত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি। অবিশ্যি, দুঃখ এবং নিস্ফলতাও বেশি। পুরুষদের মধ্যে যারা জীবনের সার্থকতা লাভ করেছে, বয়োবৃদ্ধিকে তারা ডরায় না, বরং অনেক সময়ে প্রার্থনা করে। তাদের আপনার মধ্যে আপনার অনেক নির্ভরস্থল আছে। তাই জন্যে পুরুষরা স্বভাবতঃ কুঁড়ে।— দেখেছি এত পুরুষ আছে, কিন্তু মেয়েরা নাচবার সঙ্গী পায় না। বাজনা বাজছে, সুসজ্জিত উদ্‌ঘাটিতবক্ষ মেয়েরা উৎসুকভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করছে, আর পুরুষরা দল বেঁধে জাহাজের কাঠরা ধরে অলসভাবে চুরট খাচ্ছে এবং চেয়ে আছে। Gibbsকে বললুম, তোমার নাচা উচিত। সে বললে: My dear fellow, my dancing days are over। তার বয়স ২১। শেষকালে Miss

Long চটেমটে বললে : Oh, men are so lazy! ব'লে রাগ করে মুখ ভার ক'রে বেঞ্চিতে বসে রইল। আজকাল তাই নাচ বন্ধ আছে।

Browning পড়তে পড়তে *The Englishman in Italy* বলে কবিতায় (১৫১ পৃ) দেখলুম—

Oh these mountains, their infinite movement!
still moving with you;
for ever some new head and breast of them
thrusts into view
to observe the intruder.

আমার কবিতায় পর্বত সম্বন্ধে দুটো লাইন আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিলছে—

স্থির তারা নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

আমার এ দুটো ছত্র অনেকে বুঝতে পারে না।

শনি [২৫ অক্টোবর]। অনেক দিন থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তার বিদ্যুৎবেগ এবং প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করবার ইচ্ছে ছিল। আমি চিরকাল কেবল স্বপ্ন দেখে এবং কথা কয়ে এসেছি, এই জন্যে যথার্থ কার্যের দিকে আমার ভারী আকর্ষণ আছে। শোনা যায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি বলেছিল, যুদ্ধে জয়লাভের চেয়ে যদি Grey's *Elegy* আমি লিখতে পারতুম তা হলে জীবন অধিক কৃতার্থ মনে করতুম। এর থেকে প্রমাণ হয়, প্রত্যেক মানুষেরই জীবন অসম্পূর্ণ—যে চিন্তা করে কার্যস্রোতে ঝাঁপ দেবার জন্যে তার মনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, এবং যে কাজ করে চিন্তার শিখরে উঠে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের অসীমত্ব

অনুভব করবার জন্যে তার গোপন ব্যাকুলতা থাকে। এই জন্যে য়ুরোপে যেমন স্বপ্নের আদর এমন আর কোথাও নেই। সেই নিয়মের বশে আকৃষ্ট হয়ে দুই-একটি সঙ্গী আশ্রয় করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু এই কাজের কোলাহল এবং আমোদের মত্ততার মধ্যে কি আমি তিষ্ঠতে পারি? সমুদ্রের তরঙ্গ দেখতে বেশ এবং তার কলধ্বনি শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু যে সাঁতার জানে না তীরে বসে উপভোগ করাই তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ। দেখলুম বন্ধুবান্ধব অনেকেই ঝাঁপ দিচ্ছে এবং মহা আনন্দে চীৎকার করছে, তাই দেখে আমিও তাড়াতাড়ি ঝাঁপ দিয়েছিলুম— খানিকটা নাকানি-চোবানি এবং লোনা জল খেয়ে উঠে এসেছি। এখন কিছুদিন ডাঙার উপরে সর্বাঙ্গ বিস্তার-পূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করে রোদ পোহাব মনে করছি।—

ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা—
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু seasicknessএর কথা কে মনে করেছিল! আমার এই সভ্যতার তরঙ্গের মধ্যে সেই seasicknessএর উদয় হয়েছিল। আমার এই চিরবিশ্রামশীল অন্তরাত্মা যে একটুতেই এত নাড়া খাবে এবং প্রতি নিমেষে কণ্ঠাগত হয়ে উঠবে তা কে জানত!

আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিয়ৎক্ষণ বাদে বিরলকেশ স্থূলকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হাতে উপস্থিত, স্নানের ঘর খালাস হবা-মাত্রই দেখি সে অম্লানবদনে ঢোকবার অভিপ্রায় করছে— কিছুমাত্র লজ্জা কিম্বা দ্বিধা নেই। প্রথমেই মনে হল কোনো রকম করে তাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু কোনো রকম শারীরিক

দ্বন্দ্ব আমার এমন রূঢ় এবং অভদ্র মনে হয় এবং এত অনভ্যস্ত যে কিছুতেই পারলুম না— তাকে আমার অধিকার ছেড়ে দিলুম। মনে মনে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম— ভাবলুম খৃষ্টীয় নম্রতা শুনতে খুব ভালো, কিন্তু আপাততঃ এই পশুপৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয়, কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ আমার একান্ত সংকোচজনক বোধ হল। পৃথিবীতে স্বার্থপরতা অনেক সময়ে এই জন্যে জয়লাভ করে— প্রবল ব'লে নয়, অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিত ব'লে।

খুব গরম পড়েছে। ডেকের উপরে যে যার আপন আপন easychair-এর উপর পড়ে ধুঁকছে।

রবিবার [২৬ অক্টোবর]। সকাল থেকে একটু ঝোড়ো রকম হয়ে আছে। সকলেই আক্ষেপ করছে, জাহাজে রবিবার অত্যন্ত dull, সময় কাটে না। মেয়েদের মধ্যে একটা খুব excitement, চিত্রবিচিত্র বনেট মাথায় দিয়ে রাবিবারিক বেশ-পরিধান। ইংরেজ মেয়েদের বনেটের উপর ভারী ঝোঁক— বনেটে পরস্পরকে হারিয়ে দেওয়া একটা জীবনের লক্ষ্য। Miss Mull, Miss Oswald, সকলেই বনেট বনেট করে অস্থির। কিন্তু আমার চোখে অধিকাংশ বনেট অত্যন্ত কুৎসিত এবং বর্বর বলে ঠেকে।

আর-এক সপ্তাহ। নিশিদিন উলটে পালটে কেবল কলকাতার ছবি মনে করছি।

জাহাজের দিন : সকালে ডেক ধুয়ে দিয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে, দুই ধারে ডেক্‌চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে রাশীকৃত; খালি পায়ে

রাত-কামিজ-পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধুসঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে ; ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান। স্নানের ঘরের সম্মুখে ভয়ানক ভিড়— তিনটি মাত্র স্নানের ঘর, আমরা জন চল্লিশেক লোক। সকলেই হাতে একটি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ নিয়ে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় আছে— দশ মিনিটের বেশি স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই। স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘনঘন টুপি-উদ্ঘাটন-পূর্বক মহিলাদের এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত-অভিবাদন-পূর্বক শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল। ক্ষণেক বাদে নটার সময় ঘণ্টা বেজে উঠল— breakfast প্রস্তুত, বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান-পথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে, ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না, কেবল সারি সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর— মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল এবং তার দুই পাশে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল, আমরা দক্ষিণপার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র টেবিল অবলম্বন করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধানিবৃত্তি করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরা এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ-নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়— ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোন্‌খানে টেনে নিয়ে রেখেছে তার ঠিক নেই। তার পরে চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু

গুছিয়ে নেওয়া বিষম দায়— যেখেনে একটু কোণ, যেখেনে একটু বাতাস, যেখেনে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখেনে যার অভ্যেস, সেইখেনে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ ক'রে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে তার পরে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত। তার পরে দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করছে, কিম্বা কোনো বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে আপনার চৌকিটি বিশ্লিষ্ট করে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না, তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়-ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হয়ে সুমিষ্ট ধন্যবাদ উপার্জন করে থাকি। তার পরে যে-যার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায় – ধূম্রসেবীগণ হয় ধূমকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে, কেউ বা সেলাই করছে— মাঝে মাঝে দুই-একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে সহাস্য গুন্‌গুন্ করে আবার চলে যাচ্ছে। আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্রই quoit খেলা আরম্ভ হল। দুটি বালতি পরস্পর থেকে হাত-দশেক দূরে স্থাপিত হল, দুইজুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধীপক্ষ অবলম্বনপূর্বক স্ব স্ব স্থান থেকে কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে লাগল— যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কেউ বা গণনা করতে লাগল, কেউ বা যোগ দিলে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে রইল। একটার সময় lunchএর ঘণ্টা বাজল। আবার এক-চোট আহার। তার পরে উপরে গিয়ে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত,

আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আসছে। কেবল দুই-একজন পাশাপাশি বসে দাবা back-gammon কিম্বা draft খেলছে এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিন quoit খেলছে— কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে। ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল, তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেবে এসে রুটিমাখন-মিষ্টান্ন-সংযোগে চা-রসপান করে শরীরের জড়তা পরিহারপূর্বক পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার যুগলমূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চারজন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, দিবাবসানের ক্ষীণালোকে একান্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে। দক্ষিণে জ্বলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য অস্ত গেল, এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েছে— জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে— পূর্ণিমার সন্ধ্যা যেন নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে আমাদের এই জোৎস্নাপুলকিত পূর্বভারতবর্ষের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে। জাহাজের ডেকের উপর এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময়ে ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজল, বেশপরিবর্তনের জন্যে স্ব স্ব ক্যাবিনে প্রবেশ করলে— তার পরে আধ ঘণ্টা বাদে যখন দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে গেছে, কারও বা কালো কাপড়, কারও বা রঙিন কাপড়, কারও বা শুভ্রবক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ

বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলছে, গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচের ঝন্‌ঝন্ টুংটাং শব্দ উঠছে— এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্যায় পরিচারক-দের হাতে হাতে স্রোতের মতো যাতায়াত করছে। আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল-বায়ু-সেবন— কোথাও বা যুবক যুবতী অন্ধকার একটি কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্ গুন্ করছে, কোথাও বা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো যুগল সহাস্য গল্প করতে করতে আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপদে চলে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা এক ধারে পাঁচ-সাত-জন স্ত্রীপুরুষে জটলা করে উচ্চহাস্য এবং বিবিধ প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষরা কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্ছে, কেউ বা smoking saloonএ কেউ বা নীচে খাবার ঘরে whisky soda পাশে নিয়ে চার-চার জনে দল বেঁধে whist খেলছে। এ দিকে music saloonএ সংগীতপ্রিয় দু-চার জনের সমাবেশ হয়েছে, গানবাজনা এবং মধ্যে মধ্যে করতালি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নৃত্যের আয়োজন হয়, কিন্তু পুরুষ নর্তকদের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য এবং অমনোযোগিতাবশতঃ কিছুদিন থেকে নাচ তেমন জমছে না। ক্রমে সাড়ে-দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরের আলো হঠাৎ নিবে যায়, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অন্ধকার হয়ে আসে— এবং চারি দিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের চিরকলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সোমবার [২৭ অক্‌টোবর]। Red Seaর গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপরে মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুর হরিণীর মতো pant করছে, রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মতো তাদের তাপক্লিষ্ট ম্লানমুখ দেখে

দুঃখ হয়। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁকছে এবং যুবকেরা যখন পাশে এসে করুণ স্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব অলসভাবে ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লান সহাস্যে গ্রীবাভঙ্গীদ্বারা ইঙ্গিতে আপন দুরবস্থা ব্যক্ত করছে— কিন্তু যতই lemon squash এবং পরিপূর্ণ করে lunch খাচ্ছে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, ততই নেত্র নিদ্রালস এবং সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে। আমাকে কেউ কেউ ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছে : I suppose *you* like this weather! আমি বিনীত দুঃখিত কাতরভাবে নতশিরে সসংকোচে অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি।

লোকেনকে চিঠি লেখা গেল। আজকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো খবর না থাকাতে উপরোক্ত প্যারেগ্রাফ লোকেনের চিঠি থেকে উদ্‌ধৃত করে রাখা গেল। কাল একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। লিখতে লিখতে ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল, আজ ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলুম। একটা সামান্য কবিতা লিখতে মনটাকে কী রকম করে নিংড়ে বের করতে হয় যারা পড়ে তারা বোধ হয় তার কিছুই বুঝতে পারে না, তারা কেবল ভালোমন্দ সমালোচনা করে মাত্র। কাল সকালে এডেনে পৌঁছব, তার পরে বম্বে, তার পরে কলকাতা।

মঙ্গল [২৮ অক্‌টোবর]। আজ সকালে Turnbull আমার কাছে স্বজাতির উপরে খুব আক্রোশ প্রকাশ করছিল। বলছিল : Selfish, stuck up, stiff, no manner in them। বলছিল, জাহাজে একদিন বসে ছিলুম, একজন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ভদ্রতা করে তাকে চৌকি ছেড়ে দিলুম ; সে একটি ঘণ্টা ধরে আমার চৌকি জুড়ে বসে রইল, উঠে যাবার সময় একটি thank

দিয়ে গেল না। Gibb গল্প করছিল crowded 'busএ আমি ভদ্রতা করে একজন মেয়েকে যেমনি জায়গা ছেড়ে দিলুম অমনি অম্লানবদনে তিন-চারজন মেয়ে এসে আমার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসল। তারা মনে করে তাদের এটা অধিকার, কিছুমাত্র ভদ্রতার সংকোচ নেই। Turnbull বলছিল, একদিন picture galleryতে lady friend নিয়ে গিয়েছিল, শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসেছিল, পাশে একজন মেয়েকে দাঁড়াতে দেখে তাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল, অমনি তার সহচরী কোর্তা ধরে টেনে বসিয়ে দিলে, বললে: Don't be a fool, you are not on the Continent! অর্থাৎ, এখানকার লোকেরা তো ভদ্রতার মর্যাদা বোঝে না।

এডেনে পৌঁছনো গেছে। একরাশ আরব এসে ভয়ানক গোল বাধিয়ে দিয়েছে। মনে মনে একটুখানি চিঠির আশা ছিল। steward একটা চিঠি এনে দিলে জ্যোতিদাদার হাতের অক্ষরে: S. Tagore Esq, Passenger P & O Mail Steamer, Aden। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে চিঠিতে আমি এডেনে উত্তর লিখতে অনুরোধ করেছিলুম সেটা বাবিরা পেয়েছে। যা হোক, আমার অদৃষ্টে কিছু নেই। শুনছি রবিবার রাত একটার সময় জাহাজ বম্বে বন্দরে পৌঁছবে, তা হলে তার পরদিন সমস্ত দিন গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এমন বিশ্রী লাগছে! একটা Messagerie জাহাজ এডেনের কাছে জলে ডুবে রয়েছে দেখলুম, Messagerie লাইনের আর-একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

বিকেলটা কাটাবার জন্যে বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক-এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এক-এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্তরেখা রেখে দিয়ে যায়, এবং সেইখানটা বরাবর ব্যথা করতে থাকে।—

সমস্ত দিন কোনোক্রমে কেটে যায়, কিন্তু দীর্ঘ সন্ধেবেলা ভারী ছট্‌ফটানি ধরে। সাড়ে-ছটার সময় ডিনার, তার পরে কতক্ষণ চুপচাপ করে বসে থাকি। Gibbs hurricane deckএ বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে, তখন ভারী বিরক্ত ধরে। এই-সকল নানা কারণে আমার মতো moody লোকের পক্ষে বন্ধুত্ব ভারী দুঃসাধ্য।

বুধবার [২৯ অক্‌টোবর]। দালাল ব'লে একজন পার্শি আমাদের জাহাজে আছে। তাকে প্রায় অবিকল যোগেশের মতো দেখতে— সেই রকম মুখের বেড়, সেই রকম দাড়ির ছাঁট, সেই রকম ভ্রূ এবং কপাল, কেবল এর চোখ দুটো খুব বড়ো। অল্প বয়স। ন মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, India like করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশ মেয়ে) কাছ থেকে ইতিমধ্যে তিনশো চিঠি পেয়েছে— 'কিন্তু আমি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই নে, যখন আমার আলাপীরা মনে করে আমি তাদের বন্ধু তখন সে ভুল ভাঙিয়ে দিতে আমি বিলম্ব করি নে। There's no fun keeping friends - only lot of troubles।' তার পরে বললে : I don't care for flirting. There's *no fun* in it. I have flirted with great Italian German French English girls— I am tired of it. You tell lot of lies to a girl, and she hits you with her fan— not much fun in it— I don't like the Englishmen who come from India. Therefore I don't speak to the people in this boardship— of course if they come to me and speak to me I speak to them. I speak to some twelve thirteen people in this steamer

— I speak for about two hours to a gentleman every morning. (ভালো ইংরিজি বলে না এবং ঈষৎ নতুন রকমের উচ্চারণ— speakকে spick বলে) বাঙালীদের বাবু বলে, আমাকে বলে : You speak very good English— where did you learn it? বলে : With my European dress people take me for an Italian or a French. I am not dark enough for an Indian। লোকটা আমারই মতো dark। লোকটা খুব লম্বা লম্বা কথা বলে— ভারী অদ্ভুত, ভারী stupid। বলে, আমি scientific বই ভালোবাসি। আমি বললুম, আমাকে দুই-একটা ধার দিতে পারো ? বললে, তোরঙ্গের নীচে আছে, বের করা শক্ত।

বুধবার। একটা ইংরিজি কাগজ পড়ছিলুম, তাতে আমাদের দিশি মেয়েদের দুরবস্থা সম্বন্ধে খুব কাতরভাবে লিখেছে। আমাদের দিশি মেয়েদের ঠিক অবস্থা ইংরেজদের পক্ষে বোঝা ভারী শক্ত। আমার তো মনে হয় আমাদের মেয়েরা ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি সুখী। ভালোবাসাতেই মেয়েদের জীবনের প্রকৃত সফলতা, তার থেকে আমাদের মেয়েরা বঞ্চিত নয়। নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের স্বামী এবং বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে -- ভালোবাসার সমস্ত শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে আপনাকে প্রসারিত করবার স্থান পায়। আর যাই হোক, কার্যাভাবে তাদের হৃদয় কঠিন ও শুষ্ক হবার অবসর পায় না। একজন ইংরেজ old maidএর হৃদয় কী শূন্য, কী সংকীর্ণ এবং নীরস হয়ে আছে। আমাদের বালবিধবারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ old maidএর সমতুল্য — কিন্তু বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শিশুস্নেহ গুরুভক্তি সখিত্ব বিচিত্র প্রবাহে তাদের নারীহৃদয়কে

সর্বদা কোমল ও সরস করে রাখে, সভা কিম্বা কুকুরশাবকের দ্বারা সমস্ত শূন্য জীবনকে ব্যাপৃত রাখবার আবশ্যক হয় না। আমার মনে হয়, সভ্যতার আকর্ষণে ইয়ুরোপীয় মেয়েরা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে, তাদের কেন্দ্র থেকে ছিন্ন হয়ে কক্ষের বাহির হয়ে পড়েছে। তারা প্রমোদের পাকেই ঘূর্ণ্যমান হোক, কিম্বা কার্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক, কিম্বা বিজনে কৌমার্য বা বৈধব্য -যাপন করুক, তাদের স্ত্রীপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি নেই। হয় তারা প্রমোদে উন্মত্ত, নয় তারা আন্তরিক অসন্তোষে আক্রান্ত। আর যাই হোক, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে যতই ব্যাঘাতজনক হোক, আমাদের বৃহৎ পরিবার মেয়েদের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কারণ, ভালোবাসাহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির স্বাধীনতা গৃহপ্রিয় লোকের পক্ষে যেমন নিদারুণ শূন্য। আমরা যাকে বন্ধন মনে করি মেয়েদের পক্ষে তা বন্ধন নয়। অবিশ্যি, সুখদুঃখ পুরুষদের মতো মেয়েদের জীবনেও আছে— পুরুষদের অগত্যাকাজ যেমন কঠিন, ভালোবাসার কর্তব্যও তেমনি সকল সময়ে লঘু নয়। ভালোবাসারও অনেক দায়, অনেক বালাই আছে। কিন্তু ভালোবাসার ত্যাগস্বীকার অনেক সহজ— আমার পক্ষে বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে চাপকান প'রে আপিসে যাওয়া যত কঠিন, মায়ের পক্ষে সন্তানের অনুরোধে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা তত কঠিন নয়। এই জন্যে মেয়েদের জীবন পুরুষের চক্ষে যত কঠিন ঠেকে মেয়েদের পক্ষে ততটা নয়। তাদের নিভৃত সুখদুঃখের মধ্যে থেকে উৎপাটন করে তাদের বাইরে এনে দাও, তারা কখনোই সুখী হবে না। আমাদের মেয়েরা যে ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে অসুখী বা নির্বোধ বা অশিক্ষিত তা নয়। আপন সীমানার বাইরে তারা নির্বোধ শঙ্কিত সংকুচিত— বাইরে নিয়ে গেলে তারা জানে

না কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে তারা সহৃদয়প্রতিভাশালিনী। তারা আমাদের সেবা করে, আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তবে খায়, তার থেকে যদি কেউ মনে করে আমাদের মেয়েদের আমরা অনাদর ও পীড়ন করি তবে সে মহা ভুল। অন্তঃপুরে তারা কর্ত্রী, আমরা তাদের অতিথি, তাই আমাদের এত আদর— আমরা কর্তা ব'লে নয়। এমন কথা কে কবে বলেছে আমাদের উপার্জনকার্যে মেয়েরা সাহায্য করে না, অতএব তারা স্বার্থপর ও হৃদয়হীন— কর্মক্ষেত্রে আমরা কর্তা— সেখানকার সমস্ত কষ্ট আমরা বহন ক'রে মেয়েদের তার থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। (উদর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের fable)

আমাদের মেয়েরা খুব বেশি লেখাপড়া শেখে নি তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজি-শিক্ষার কী ফল কে জানে। নাহয় ঘরের মধ্যে একটা দিশি শিক্ষার দুর্গ রইল তাতে ক্ষতি কী? বাল্যকাল থেকে বিদেশী ভাষা -শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন এবং চিন্তাশক্তি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা পুরুষরা তো ইংরিজি শিক্ষার তা লেগে লেগে অতি শীঘ্র অকালে পেকে যাচ্ছি, আমাদের অন্তঃপুরে নাহয় অন্তর থেকে বাংলা রসাকর্ষণ করে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক পরিণতির একটা পরীক্ষাস্থল থাক্। ইংরিজি শিক্ষা বাংলার মধ্যে দিয়ে তাদের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করুক এবং বর্তমান অবস্থাবিপর্যয়ের সঙ্গে অল্পে অল্পে তাদের সামঞ্জস্যসাধন হোক। এই-যে বইগুলো লিখছি এবং ছাপাচ্ছি এবং বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, নিদেন মেয়েরা পড়ুক, না পড়ে তো কিনুক।

ইংরেজরা একটা বুঝতে পারে না যে, ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ এবং দিশি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বৈলক্ষণ্য প্রায় সমান। ইংরাজ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যদি শিক্ষা স্বাধীনতার সাম্য থাকত, তা হলে Millএর বই লেখবার

এবং বর্তমান বিদুষীমণ্ডলীর বিদ্রোহ করবার কোনো কারণ থাকত না। আমরা মাটি কামড়ে কোনোমতে ঘরের প্রাঙ্গণটিতে পড়ে থাকি, আমাদের মেয়েরা সেই ঘরের অন্তঃপুরে বিরাজ করে। তোমরা পুচ্ছ-আস্ফালনে সমস্ত সংসার ঘোলা করে বেড়াও, তোমাদের মেয়েরা তোমাদের অনুবর্তী। কিন্তু এখনও তোমরা পুরুষরাই প্রধান, তোমরাই প্রভু— তোমাদের স্ত্রীরা অনুগত ছায়া। তোমাদের তুলনায় তোমাদের স্ত্রীরা অশিক্ষিত।

বিধবাবিবাহ না থাকাতে আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত কষ্ট? তোমাদের দেশে কুমারীবিবাহ বন্ধ হয়ে সমাজে যত অনাথা স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ বন্ধ হয়ে তত হয় নি। সমাজের মঙ্গলের প্রতি যদি লক্ষ করা যায় তবে আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ অসম্ভব, তোমাদের দেশে অবস্থা-বিশেষে বিধবাবিবাহ আবশ্যক। সকল সমাজনিয়মই আপেক্ষিক। আমাদের সমাজ তোমরা কিছুমাত্র জানো না, এই জন্য আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তোমরা কিছুই বুঝতে পারো না।

যেমন লোকভেদে তেমনি জাতিভেদে সুখদুঃখ বিভিন্ন। আমি যখন গাজিপুরে থাকতুম তখন ইংরেজরা মনে করত, আমোদ প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ -অভাবে আমি বুঝি ভারী ম্রিয়মাণ হয়ে আছি। তাই আমাকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করত এবং ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে অনুরোধ করত। আমি যে আমার ঘরের কোণে সন্ধেবেলা আলোটি জ্বেলে আমার আপনার লোক নিয়ে কত সুখে থাকতুম তা তারা বুঝতে পারত না। একজন Lady Dufferin -মেয়ে-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে অপরিষ্কার ছোটো ঘর, ছোটো জানলা, ময়লা বিছানা, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্‌স্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি, তখন সে মনে করে— কী সর্বনাশ!

কী ভয়ানক কষ্টের জীবন! এদের পুরুষরা কী স্বার্থপর! স্ত্রী-লোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে! জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, রস্কিন পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, কেরানিগিরি করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ওই মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা সচ্ছল হলেই স্ত্রীর গয়না গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি। ওগো, তবু আমরা জন্তু নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই, কিন্তু তবুও আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোষের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই। ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে তবুও আমাদের ছেলেরা তোমাদেরই মতো agnostic হয়ে আসছে।— আমরা আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা আর-এক রকমের কৌচ কেদারা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও চলে। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে তোমাদের ভালোবাসা। আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে আরাম থাক্ বা না থাক্।

কিন্তু তোমরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহৎ কার্য করেছ, অতএব তোমাদের সমস্ত প্রথাকেই মানবের উন্নতির অনুকূল বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরাও এক কালে উন্নত জাতি ছিলুম, এই বিপুল স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আমাদের পতন হয়েছে— এবং কে বলতে পারে ঐ উত্তরোত্তরবর্ধনশীল স্তূপাকৃত আরামের মধ্যেই তোমাদের সভ্যতার সমাধি হবে না? ভারতবর্ষে পারিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে পড়েছিল যে

সমাজের সমস্ত শক্তি পরিবাররক্ষার মধ্যেই পর্যবসিত হয়েছিল, সংহত পরিবারের চাপে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের স্ফূর্তি বন্ধ হয়ে সমস্ত একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠছে যে, স্বাধীন গতিবিধির পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তোমাদের পরিবারপ্রতিষ্ঠার শক্তি বন্ধ হয়ে আসছে— পণ্ডিতগণ ভীতভাবে মন্ত্রণা দিচ্ছেন, এবং socialism মধ্যে মধ্যে নখদন্ত বিকাশের উপক্রম করছে।

মাঝের থেকে মেয়েদের আর মেয়ে থাকবার যো নেই, তাদের পুরুষ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। য়ুরোপে ক্রমে গৃহ নষ্ট হয়ে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে— যে যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easychairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, চুরটের পাইপটি এবং একটি ক্লাব নিয়ে নির্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। সুতরাং মেয়েদের মৌচাক ভেঙে যাচ্ছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞীমক্ষিকারা কর্তৃত্ব করত— এখন চাক বাঁধা বন্ধ করে যে যার আপনার একটি কক্ষ ভাড়া ক'রে সকালে মধু উপার্জন ক'রে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানীমক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধু দান এবং মধু পান করবার সময় আর নাই। স্ত্রীপুরুষের এই স্বাভাবিক অবস্থাবিপর্যয়ের জন্য য়ুরোপীয় সমাজের কী কোনো ক্ষতি হবে না? একবার ভালো করে ভেবে দেখো, আমাদের স্ত্রীরা অসুখী না তোমাদের স্ত্রীরা অসুখী। আমাদের স্ত্রীরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খায় না, কিন্তু তাদের কোমল স্নেহশীল হৃদয় সর্বদাই পরিপূর্ণ— কোনো অবস্থাতেই তারা গৃহহীন নয়।

কেউ যেন না মনে করে মেয়েদের গাড়ি চড়ে হাওয়া খাওয়াকে আমি দূষণীয় জ্ঞান করি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই, গাড়ি

চড়ে হাওয়া না খেয়েও তারা এক রকম সুখে আছে, হাওয়া খেয়ে তারা আরও সুখী হয় আরও ভালো। অন্তঃপুরের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও তাদের হৃদয়ের অভাব নেই, জ্ঞান ও স্বাধীনতা -বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা আরও বাড়ে তো আরও ভালো। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের মধ্যে মন্দ যেমন আছে তেমনি ভালোও আছে— তোমরা যতটা বিভীষিকা দেখ ততটা কিছু নয়। আমার ধর্ম যে মানে না সে চিরনরকে দগ্ধ হবে এ যেমন গোঁড়া খৃস্টানি, আমাদের মতো যাদের প্রথা নয় তারা অসুখী এও তেমনি গোঁড়া দ্বৈপায়নতা।

শুক্রবার [৩১ অক্টোবর]। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়ে আসছে। এখন আমাদের বাইরে বিক্ষিপ্ত হবার সময়, কেবলমাত্র পরিবার-প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কাজ বলে ধরে নিলে চলবে না। ইংরেজের সংঘর্ষে এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চিরদিন অপমানিত এবং ধিক্কৃত হয়ে আর জীবনধারণ করা চলে না। শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, আপনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচালিত করতে হবে— পৃথিবীতে আপনার উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক। এখন কেবল তাদের গৃহের সামগ্রী করলে চলবে না। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যেও এই নবজীবনের উন্মেষ আবশ্যক।

আজ সন্ধের সময় Hamiltonএর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে বলছিল : তোমরা আর যাই করো, য়ুরোপের নকল কোরো না— Then you are nowhere, you are lost! তোমাদের ধর্ম, তোমাদের সভ্যতা, সহস্র সহস্র বৎসর টিঁকে আছে। কিন্তু চার

শো বৎসর আগে আমরা কী ছিলুম ? চার শো বৎসর পরে আমরা কী থাকব ? আমাদের বড়ো বড়ো নগরের মধ্যে কী ভয়ানক পঙ্কিলতা প্রবেশ করেছে ভেবে দেখলে আশা থাকে না।

শনিবার [১ নবেম্বর]। Dillon মৃত্যুশয্যায় শয়ান। বম্বে পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সন্দেহস্থল। বৃদ্ধ আমাদেরই সঙ্গে এক জাহাজে য়ুরোপে গিয়েছিল। কাল সন্ধেবেলায় যখন গানবাজনা নাচ হচ্ছিল, এবং আজ সকালে যখন খেলা চীৎকার হাসি চলছিল, তখন চতুর্দিকের এই জীবনের কলরব তার কানে প্রবেশ করে কিরকম লাগছিল ! আজ সুন্দর সকালবেলা, ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রোদ্দুর উঠেছে, কেউ বা quoit খেলছে, কেউ বা নবেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে, music saloonএ গান চলছে, smoking saloonএ তাস চলছে, dining saloonএ lunch খাবার আয়োজন হচ্ছে— আর Dillon মরছে।

আজ সন্ধে আটটার সময় Dillonএর মৃত্যু হল। আজ সন্ধের সময় একটা অভিনয় হবার কথা ছিল, হল না।

Gibbs আজ আবার তাদের মেয়েদের কথা বলছিল। বলছিল, মেয়েরা ক্রমে ভারী নির্লজ্জ হয়ে আসছে, তারা অম্লানবদনে প্রকাশ্যে উলঙ্গপ্রায় পুরুষদের ব্যায়ামক্রীড়া ও swimming match দেখতে যায়— এবং picture saloonএর কথা বললে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খারাপ লাগে না। এই উলঙ্গ দৃশ্যের মধ্যে একটা বেশ অসংকোচ healthiness আছে— আর্ধেক ঢাকাঢাকি এবং suggestivenessই কুৎসিত, যেমন ball-roomএ মেয়েদের বুক-খোলা কাপড় এবং নাচ। waltz নাচ সম্বন্ধে Gibbs যে রকম করে বলছিল সে আমি লিখতে পারি নে— সে শুনে আমার ভারী লজ্জা এবং কষ্ট হচ্ছিল। youngmanরা এ সম্বন্ধে যে রকম ভাবে

কথা কয় মেয়েদের শোনা উচিত। ইতিপূর্বে একদিন আশু এবং লোকেনের কাছে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনেছিলুম।

ডিনার-টেবিলে Third Officer গল্প করছিল— Hurricane ডেকের উপর তাদের ঘরের পাশে আজকাল সন্ধেবেলায় অন্ধকারে অনেক চুম্বনের শব্দ শোনা যাচ্ছে— জাহাজ গম্যস্থানের নিকটবর্তী হয়েছে, বিদায়ের সময় এসেছে, তারই আয়োজন। শুনে Miss Hedistedt লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। 3rd Off. গল্প করলে : আর-একবার সমুদ্রযাত্রায় সে চীনদেশ থেকে কাপড়ের পাড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই দেখাবার জন্যে একজন মা এবং মেয়ে যাত্রীকে তার ক্যাবিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাড় দেখা হয়ে গেলে মা এগিয়ে গেল, মেয়ে একটু পিছিয়ে রইল। Officer তার কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়াতে মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল : Won't you kiss me ? Off. : No. Why ? মেয়ে : But other officers always kiss me when they take me to their cabin।— শুনে আমরা এবং মেয়েরা সবাই অপ্রস্তুত। লোকটার মুখে কিছুই বাধে না।

রবি [২ নবেম্বর]। আজ সকাল আটটার সময় ডিলনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল। আমি দেখতে গেলুম। একটা টেবিলের উপরে কফিন পড়ে আছে। Hamilton, Connolly, এক দল পর্টুগীজ ভৃত্য, এবং দু-তিনজন ক্যাথলিক মেয়ে হাঁটু গেড়ে কফিন ঘিরে রোমান ক্যাথলিক burial service পড়ছে। আর, সকলে কালো কাপড় প'রে টুপি খুলে চারি দিকে নীরবে দাঁড়িয়ে। প্রার্থনা হয়ে গেলে পরে কফিন সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। তার পরে জাহাজ আবার চলতে লাগল। এই অন্ত্যেষ্টিসংকারের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন আগত হল।

আজ রাত্তিরে জাহাজ বম্বে পৌঁছবে। স্পেশল ট্রেনে আমাকে যেতে দেবে কি না কে জানে— তা না হলে মেজদাদাদের চিঠি একদিন আগে গিয়ে পৌঁছবে, আমার হঠাৎ গিয়ে পড়বার কল্পনা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। কূলে এসে তরী ডোবা একেই বলে।

আর ডায়ারি বন্ধ করা যাক্।—

২ মাস এগারো দিন কেটে গেল। মনে হচ্ছে কত যুগ। রাত তুপুরের সময় বম্বে পৌঁছনো গেল। স্পেশল ট্রেন ধরতে পারলুম না— তাই ভারতবর্ষে পৌঁছেও মন ভারী বিগড়ে আছে— হঠাৎ গিয়ে পড়ব ব'লে কত কী কল্পনা করেছিলুম, এক দিনের জন্যে সমস্ত ফস্কে গেল। বাড়ি যতই কাছে আসছে মন ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছে। gravitationএর নিয়মানুসারে ভার পৃথিবীর যতই নিকট-বর্তী হয় তার বেগ ততই বাড়ে— মনেরও সেই নিয়ম দেখছি। কাল সমস্ত রাত এক মুহূর্ত ঘুমোই নি। আজ সকালে তাড়াতাড়ি Watsons Hotelএ বেরিয়ে পড়লুম। এখেনে এসে দেখি আমার টাকার ব্যাগটি জাহাজে ফেলে এসেছি। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তার মধ্যে আমার return ticket এবং টাকা। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আবার সেই জাহাজে চললুম। সেই পুরোনো ক্যাবিনের pegএ ব্যাগটি ঝুলছে— ধড়ে প্রাণ এল। এ রকম ফিরে পেলে হারিয়ে সুখ আছে। ব্যাগটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে সমস্ত পৃথিবী আনন্দময় বোধ হল। আমার মতো লোকের ঘর ছেড়ে এক পা বেরোনো উচিত নয়। যখন আমার biography বেরোবে তখন এই-সমস্ত অন্যমনস্কতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারী আমোদজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে, কিন্তু আপাততঃ ভারী অসুবিধে। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল সন্ধেবেলায় একবার মনে উদয় হয়েছিল। তার পরে মনকে বিশেষ করে

সাবধান করে দিলুম, ব্যাগটা যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! টাকার ব্যাগ আমি ভুলি! আজ সকালে তাকে আচ্ছা এক-চোট গাল দিয়ে নিয়েছি। সে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পরে যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ভরসা করি আজ সন্ধেবেলায় আবার ভুলব না। আজ সন্ধেবেলায় সমস্ত গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে যখন গাড়িতে চড়ে বসব তখন মনটা একবার নৃত্য করে উঠবে— তার পরে হুগলির কাছাকাছি গিয়ে যখন সকাল হবে— তখন—। ঐ breakfastএর ঘণ্টা বাজল— খেয়ে আসি, ক্ষিধে পেয়েছে।

গাড়ির জন্যে একটা বালিশ কিনেছিলুম— সেটা হোটেলে ফেলে এসেছি।

আমাদের good morning প্রভৃতি কোনোরকম greeting নেই বলে Gibbs আমাদের নেহাত অসভ্য মনে করেছে।

Truth কাগজ থেকে একটা জায়গা উদ্‌ধৃত করে রাখি :

The expression of a fashionably-dressed woman is now emphatically one of nakedness. Her sleeveless bodice, cut halfway to her waist, betrays much and suggests more. Her large white arms, her uncovered shoulders crossed with an airy line, her bust displayed to the last inch permitted by the law which protects morality and forbids obscenity, her back bared in a wedge-shaped track to her band, the colour of her gown scarce distinguishable from her skin, and the

"fit" one which moulds the figure and makes no pretence at disguise— in this indecent nudity she offers herself to public admiration ; and the bold looks of the men are the caresses which make her purr with pride and pleasure. Her dress is her note of invitation ; and if but few honestly confess, no one is deceived.

Orientalদের dishonesty সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রায় আলোচনা করে থাকে, তাই নিম্নের খবরটা টুঁকে রাখা গেল : *Truth :* Oct. 16, 1890 :

The writer was yesterday in a city restaurant, when, in an adjoining box he overheard scraps of conversation which, at first, were meaningless to him ; but, in the light of something he had heard earlier in the day, he was able to piece out one of those stories of trickery and fraud in connection with the Stock-Exchange which, as a rule, the public only hear of after the victims are ruined. The party were very jubilant, and the copious champagne that they indulged in made them possibly more reckless than in their sober moments they would have been. Briefly, what was overheard made it clear that the party were members of a ring which had for its purpose the breaking down of the credit of some wellknown South African shares, and

some important information was alluded to that was being kept in the background until the right moment — that is, when an immediate rise was to follow. . . The writer encloses his private card, and, in confidence, would be happy to answer any inquiries.

Editor remarks : My correspondent, who is highly respectable, and is unconnected with financial jobbery etc.

আসল কথা হচ্ছে, পরের জাত সম্বন্ধে আমরা যেটা দেখি এবং শুনি সেইটেই আমাদের কাছে মস্ত হয়ে ওঠে— তার সমস্তটা আমরা তদন্ত করতে পারি নে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি generalize করে একটা মত খাড়া করি।

আজ আমরা এডেন বলে এক জায়গায় পৌঁছব। অনেক দিন পরে ডাঙা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে নাবতে পারব না, পাছে সেখান থেকে কোনো রকম ছোঁয়াচে ব্যামো নিয়ে আসি। এডেনে পৌঁছে আর-একটা জাহাজে বদল করতে হবে, সেই একটা মহা হাঙ্গাম রয়েছে। এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কী বলব— তিন দিন ধরে যা একটু কিছু মুখে দিয়েছি অমনি তখনি বমি করে ফেলেছি— মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির— বিছানা ছেড়ে উঠি নি— কী করে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে এক ধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বললুম, ছোটোবউ, মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম— বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কি না। তার পরে বেলি খোকাকে হামি দিয়ে ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়ে ছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারী মন ছট্‌ফট্ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মতো এমন জায়গা আর নেই— এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না। আজ এক হপ্তা বাদে প্রথম স্নান করেছি। কিন্তু স্নান করে কোনো সুখ নেই— সমুদ্রের নোনা জলে নেয়ে সমস্ত গা চট্‌চট্ করে— মাথার চুল-গুলো এক রকম বিশ্রী আটা হয়ে জটা পাকিয়ে যায়— গা কেমন

করে। মনে করছি যতদিন না জাহাজ ছাড়ব আর স্নান করব না। ইউরোপে পৌঁছতে এখনো হপ্তাখানেক আছে— একবার সেইখানে পৌঁছে ডাঙায় পা দিয়ে বাঁচি। এই দিন-রাত্রি সমুদ্রে আর ভালো লাগে না। আজকাল যদিও সমুদ্রটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, জাহাজ তেমন ত্বলছে না, শরীরেও কোনো অসুখ নেই— সমস্ত দিন জাহাজের ছাতের উপরে একটা মস্ত কেদারার উপরে প'ড়ে হয় লোকেনের সঙ্গে গল্প করি নয় ভাবি, নয় বই পড়ি। রাত্তিরেও ছাতের উপরে বিছানা করে শুই, পারৎপক্ষে ঘরের ভিতরে ঢুকি নে। ঘরের মধ্যে গেলেই গা কেমন করে ওঠে। কাল রাত্তিরে আবার হঠাৎ খুব বৃষ্টি এল— যেখানে বৃষ্টির ছাঁট নেই সেইখানে বিছানাটা টেনে নিয়ে যেতে হল। সেই অবধি এখন পর্যন্ত ক্রমাগতই বৃষ্টি চলছে। কাল বেড়ে রোদ্‌দুর ছিল। আমাদের জাহাজে ত্বটো-তিনটে ছোটো ছোটো মেয়ে আছে— তাদের মা মরে গেছে, বাপের সঙ্গে বিলেত যাচ্ছে। বেচারাদের দেখে আমার বড়ো মায়া করে। তাদের বাপটা সর্বদা তাদের কাছে কাছে নিয়ে বেড়াচ্ছে— ভালো করে কাপড়-চোপড় পরাতে পারে না, জানে না কিরকম করে কী করতে হয়। তারা বৃষ্টিতে বেড়াচ্ছে, বাপ এসে বারণ করলে, তারা বললে 'আমাদের বৃষ্টিতে বেড়াতে বেশ লাগে'— বাপটা একটু হাসে, বেশ আমোদে খেলা করছে দেখে বারণ করতে বোধ [হয়] মন সরে না। তাদের দেখে আমার নিজের বাচ্ছাদের মনে পড়ে। কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম— সে যেন স্টীমারে এসেছে— তাকে এমনি চমৎকার ভালো দেখাচ্ছে সে আর কী বলব— দেশে ফেরবার সময় বাচ্ছাদের জন্যে কিরকম জিনিস নিয়ে যাব বলো দেখি। এ চিঠিটা পেয়েই যদি একটা উত্তর দাও তা হলে বোধ

হয় ইংলন্‌ডে থাকতে থাকতে পেতেও পারি। মনে রেখো মঙ্গলবার দিন বিলেতে চিঠি পাঠাবার দিন। বাচ্ছাদের আমার হয়ে অনেক হামি দিয়ো ··· ···

'শ্যাম'। শুক্রবার
[২৯ অগস্ট্‌ ১৮৯০]

পরশু তোমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি— আজ আবার আর-একটা লিখছি— বোধ হয় এ দুটো চিঠি এক দিনেই পাবে— তাতে ক্ষতি কী? কাল আমরা ডাঙায় পেঁছিব— তাই আজ তোমাকে লিখে রাখছি। আবার সেই ইংলন্‌ডে পৌঁছে তোমাদের লেখবার সময় পাব। যদি যাতায়াতের গোলমালে এর পরের হপ্তায় চিঠি ফাঁক যায় তা হলে কিছু মনে কোরো না। জাহাজে চিঠি লেখা বিশেষ শক্ত নয়— কিন্তু ডাঙায় উঠে যখন ঘুরে বেড়াব, কখন্‌ কোথায় থাকব তার ঠিকানা নেই, তখন দুই-একটা চিঠি বাদ যেতেও পারে। আসলে ধরতে গেলে পরশু থেকে য়ুরোপে পৌঁচেছি। মাঝে মাঝে দূর থেকে য়ুরোপের ডাঙা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের জাহাজটা এখন ডান দিকে গ্রীস আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে। দ্বীপটা খুব কাছে দেখাচ্ছে— কতকগুলো পাহাড়, তার মাঝে মাঝে বাড়ি, এক জায়গায় খুব একটা মস্ত শহর— দূরবীন দিয়ে তার বাড়িগুলো বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম— সমুদ্রের ঠিক ধারেই নীল পাহাড়ের কোলের মধ্যে শাদা শহরটি বেশ দেখাচ্ছে। তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে না ছুটকি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আসতে হবে তা জানো? তা মনে করে তোমার খুশি হয় না? যা কখনো স্বপ্নেও মনে কর নি সেই সমস্ত দেখতে পাবে। দুদিন থেকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ে

আসছে—খুব বেশি নয়—কিন্তু যখন ডেকে বসে থাকি এবং জোরে বাতাস দেয় তখন একটু শীত-শীত করে। অল্পস্বল্প গরম কাপড় পরতে আরম্ভ করেছি। আজকাল রাত্তিরে ডেকে শোওয়াটাও ছেড়ে দিতে হয়েছে। জাহাজের ছাতে শুয়ে লোকেনের দাঁতের গোড়া ফুলে ভারী অস্থির করে তুলেছিল। আমরা যে সময়ে এসেছি নিতান্ত অল্প শীত পাব—দার্জিলিঙে যে রকম শীত ছিল তার চেয়ে ঢের কম। ছাড়বার সময়-সময় একটু শীত হবে হয়তো। আমি অনেকগুলো অদরকারী কাপড়-চোপড় এবং সেই বালা-পোষখানা মেজবোঠানের হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি – সেগুলো পেয়েছ তো ? না পেয়ে থাক তো চেয়ে নিয়ো। সেগুলো একবার লক্ষ্মীর হাতে পড়লে সমস্ত মেজবোঠানের আলমারির মধ্যে প্রবেশ করবে। বেলির জন্যে আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজবোঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি—সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ—খুব টুক্‌টুকে লাল কাপড়—বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে—পাড়টাও বেশ নতুন রকমের—না ? মেজবোঠানও বেলির জন্যে তার একটা প্রাইজের কাপড় নিয়েছেন—নীলেতে শাদাতে—সেটাও বেলুরানুকে বেশ মানাবে। সেটা যে রকমের ভাবুনে, নতুন কাপড় পেয়ে বোধ হয় খুব খুশী হয়েছে। আমাকে কি সে মনে করে ? খোকাকে ফিরে গিয়ে কিরকম দেখব কে জানে। ততদিনে সে বোধ হয় দুটো-চারটে কথা কইতে পারবে। আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারবে না। হয়তো এমন ঘোর সাহেব হয়ে আসব তোমরাই চিনতে পারবে না। আমার সেই আঙুল কেটে গিয়েছিল, এখন সেরে গেছে, কিন্তু খুব দুটো গর্ত হয়ে আছে —ভয়ানক কেটে গিয়েছিল। অনেক দিন বাদে কাল-পরশু দুদিন স্নান করেছি—আবার পরশু দিন প্যারিসে পৌঁছে নাবার বন্দোবস্ত

করতে হবে। সেখেনে ‘টার্কিশ বাথ’ ব’লে এক রকম নাবার বন্দোবস্ত আছে, তাতে খুব করে পরিষ্কার হওয়া যায়— বোধ হয় আমার ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে’ তার বিষয় পড়েছ— যদি সময় পাই তো সেইখেনে নেয়ে নেব মনে করছি। আমার শরীর এখন বেশ ভালো আছে— জাহাজে তিন বেলা যে রকম খাওয়া চলে তাতে বোধ হচ্ছে আমি একটু মোটা হয়ে উঠেছি। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোটোবউ। গাড়িটা তো এখন তোমারই হাতে প’ড়ে রয়েছে— রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলই পরকে ধার দিয়ো না। কাল রাত্তিরে আমাদের জাহাজের ছাতের উপর স্টেজ খাটিয়ে একটা অভিনয়ের মতো হয়ে গেছে— নানা রকমের মজার কাণ্ড করেছিল, একটা মেয়ে বেড়ে নেচেছিল। তাই কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ জাহাজে শেষ রাত্তির কাটাব। ... ...

[৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯০]

ভাই ছোটোবউ— আমরা ইফেল টাউয়ার বলে খুব একটা উঁচু লৌহস্তম্ভের উপর উঠে তোমাকে একটা চিঠি পাঠালুম। আজ ভোরে প্যারিসে এসেছি। লন্‌ডনে গিয়ে চিঠি লিখব। আজ এই পর্যন্ত। ছেলেদের জন্যে হামি।

প্যারিস

৯ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার। ১৮৯০

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা ব'লে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা-কিছু ভালোবাসা, যা-কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না— আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

লন্‌ডন
৩ অক্টোবর ১৮৯০

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে ? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা— তার এত দিকে গতি— এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে - ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'— তা হলে

পরিবর্তন হবে, আর কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব। এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আশ্চর্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই, এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের মনে করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে একটি কোমল তৃণ, একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছু-মাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।’[১]

এখনকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলো মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।··· আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে— যথাসময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংলন্ড্‌-যাত্রা করেন সতেরো বৎসর বয়সে (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮), প্রায় দেড় বৎসর কাল প্রবাসে অতিবাহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৮০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সময় বিলাত হইতে প্রেরিত তাঁহার 'পত্র'-প্রবন্ধাবলী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে ভারতী পত্রে ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতি গ্রন্থেও এই প্রবাসযাপনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার তিনি বিদেশযাত্রা করেন ১৮৯০ সনের অগস্টে। এবার বিলাতে থাকা অল্পকালের জন্য, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই দেশে ফিরিয়া আসেন। এই 'দুই মাস এগারো দিন' সমুদ্রপারে যাওয়া-আসার ও বিলাতে থাকার যে দিনলিপি রাখা হইয়াছিল তাহারই সাহায্যে প্রথম বর্ষের সাধনা পত্রে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' নিম্নমুদ্রিত ক্রমে ও শিরোনামে ক্রমশ প্রকাশিত হয়—

সাধনায় রচনার নাম	দিনলিপির তারিখ		সাধনা
যাত্রা আরম্ভ	২২-২৩ অগস্ট্‌ ১৮৯০	১২৯৮	অগ্রহায়ণ
আমার সহযাত্রী	২৬ অগস্ট্‌		পৌষ
তরী পরিবর্ত্তন	২৭-২৯ অগস্ট্‌		মাঘ
লোহিত সমুদ্রে	৩০ অগস্ট্‌		ফাল্গুন
ভূমধ্যসাগরে	৩১ অগস্ট্‌ - ৬ সেপ্টেম্বর		চৈত্র
রেলপথের দুই পার্শ্বে	৭ সেপ্টেম্বর	১২৯৯	বৈশাখ
প্যারিস্‌ হইতে লণ্ডনে	৮-১১ সেপ্টেম্বর		জ্যৈষ্ঠ
লণ্ডনে	১২ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর		আষাঢ়
ভাসমান	৬-১০ অক্টোবর		শ্রাবণ
জাহাজের কাহিনী	১৪-২৪ অক্টোবর		ভাদ্র-আশ্বিন
যাত্রা-সমাপন	২৬ অক্টোবর - ৪ নবেম্বর		কার্তিক

য়ুরোপে তথা ইংলন্ডে যাওয়া-আসায় পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে যেরূপ চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও

তিনি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করেন এবং 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র এক 'বিশেষ অধিবেশনে' পাঠ করেন। ইহাতে আলোচিত কোনো কোনো বক্তব্যবিষয় সংক্ষিপ্তভাবে মূল দিনলিপিতেও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) প্রথম খণ্ড' আখ্যায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়; বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত প্রকাশকাল— ১৬ বৈশাখ ১২৯৮ (১৮৯১)।

সাধনায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত ভ্রমণবৃত্তান্তটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। দ্বিতীয় খণ্ড' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশলাভ করে; আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশ-কাল— ৮ আশ্বিন ১৩০০ (১৮৯৩)।

মূল দিনলিপি[২] শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর নিকট বহুকাল সংরক্ষিত ছিল; তিনি উহা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে উপহার দেন। উহাতে বহু অপ্রকাশিত বিবরণ পরিলক্ষিত হওয়ায় ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার অষ্টম ও নবম বর্ষের পাঁচটি সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৫৬ - পৌষ ১৩৫৭) ধারাবাহিক-ভাবে উহা প্রকাশিত হয়; পুনর্বার পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া বর্তমানে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

মূল দিনলিপি বা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া' ব্যতীত বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি চিঠি ও জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ সংকলিত হইল। পাঁচখানি চিঠির প্রথম তিনখানি এ যাত্রায় ইংলন্ড্ যাইবার পথে কবিপত্নী শ্রীমতী মৃণালিনীদেবীকে লেখা হয় আর ইংলন্ডে পৌঁছিয়া কবি অন্য দুইখানি লেখেন শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে। বহু-পরবর্তী জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে যে রচনাংশ সংকলিত হইল তাহাতে কেবল যে এই বিদেশযাত্রার বিশেষ উল্লেখ আছে তাহাই নয়, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পর্কে রবীন্দ্র-চিত্তের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর আভাসে প্রাচ্য জীবনযাত্রা বা জীবনাদর্শের সহিত উহার তুলনাও দেখা যায়— এ রচনা 'য়ুরোপ-যাত্রী'র অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার ও মূল বক্তব্যের ভাষ্য বা টীকা রূপে গ্রহণ করা যায় সন্দেহ নাই।

---

[২] ইহাই বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত . য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী -কর্তৃক রবীন্দ্রসদনে উপহৃত মূল দিনলিপির ন্যায় বর্তমান গ্রন্থে সংকলনযোগ্য মনে না হইলেও, উপস্থিত প্রসঙ্গে আর-একখানি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নিকট হইতে সংগৃহীত; মনে হয়, ইহা মূল দিনলিপি ও 'সাধনা' পত্রে 'ডায়ারি'র আংশিক প্রকাশ উভয়ের অন্তরবর্তীকালীন। এই খাতাখানির প্রথমাবধি ষোলোটি পাতায়, বত্রিশ পৃষ্ঠায়, মুদ্রিত 'ডায়ারি'র প্রথম খণ্ডের প্রায় পূর্ণ পরিণত রূপ অবিচ্ছেদে পাওয়া যাইতেছে; রচনাশেষে কবির হস্তাক্ষরে তারিখ দেখা যায়: ১৫ই মাঘ। মঙ্গলবার। ১৮৯১। —পরবর্তী বাইশটি পাতায় বা চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় ডায়ারির দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্ণতর (মূল দিনলিপির তুলনায়) পাঠ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; ইহারও সব-শেষে কবি স্থানকালের নির্দেশ দিয়াছেন: ১৪ ফেব্রুয়ারি, শিলাইদহ। ১৮৯১। ৩ ফাল্গুন। —অর্থাৎ, ১৮৯০ নভেম্বরে কবি দ্বিতীয়বারের বিলাত-যাত্রা হইতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে যে ডায়ারি লেখা সমাপ্ত হয়, ১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রকাশযোগ্য রূপান্তর সমাধা করেন আর ঐ বৎসরেই নভেম্বর-ডিসেম্বরে (বাংলা অগ্রহায়ণ ১২৯৮) 'সাধনা' আত্মপ্রকাশ করিলে উহার প্রথম সংখ্যা হইতেই আরও রূপান্তরিত করিয়া 'ডায়ারি'র কিয়দংশ (দ্বিতীয় খণ্ড) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। 'ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড -স্বরূপ 'ভূমিকা'টি, সাধনার সূচনা না হইতেই ১২৯৮ বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় —ইহা আমাদের জানা আছে।

মূল দিনলিপি বা 'খসড়া', মুদ্রণপূর্ব অন্য পাণ্ডুলিপি, 'সাধনা'য় মুদ্রিত পাঠ এবং প্রথম-প্রচারিত দুই খণ্ড গ্রন্থ —কোনো একটির পাঠ অন্যান্যের যথাযথ প্রতিরূপ বা প্রতিলিপি বলা যায় না— বিষয়ে বা বক্তব্যে মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও, ভাষায় ভঙ্গীতে শব্দচয়নে এবং বক্তব্যের সংক্ষেপণে বা অলংকরণে পদে পদেই ভিন্নতা দেখা যায়। 'খসড়া'র কথা ছাড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক বারই রচনায় কিছু-না-কিছু যোগ বিয়োগ ও পাঠপরিবর্তন করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নিকট হইতে সংগৃহীত, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির যে-দুটি অংশের প্রতিরূপ এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল, তাহার প্রথমটি যেমন মুদ্রিত পাঠের

(বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৪৯) প্রায় অনুরূপ, দ্বিতীয়টি যে পূর্বমুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ (বর্তমান গ্রন্থে পৃ ১৩৩-৩৪) এবং 'খসড়া'র পাঠ (বর্তমান গ্রন্থে পৃ ২৪৩-৪৫) উভয় হইতেই বহুশঃ পৃথক্ তাহা স্পষ্টই দেখা যাইবে।

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র কোনো খণ্ডই বহুকাল গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ১৯০৭-১৯০৯ খৃস্টাব্দে যোলো খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্য গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়; এই উপলক্ষ্যে 'ডায়ারি'র বিভিন্ন অংশ উহার বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচুর সম্পাদন ও সংক্ষেপণ -পূর্বক গৃহীত হয়। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র 'ভূমিকা' বা 'প্রথম খণ্ড' দুইটি প্রবন্ধে ভাগ করিয়া সূচনাংশ 'নূতন ও পুরাতন' নামে 'স্বদেশ' গ্রন্থে আর পরবর্তী অংশ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলন করা হয়। ভ্রমণবৃত্তান্ত অংশ বা 'দ্বিতীয় খণ্ড' গৃহীত হয় 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে, অর্থাৎ গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩৪৩) প্রকাশিত 'পাশ্চাত্যভ্রমণ' গ্রন্থে সংশোধিত আকারে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের সহিত 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র 'দ্বিতীয় খণ্ড' মুদ্রিত হয় এবং ঐভাবেই রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৬) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পাঠসঞ্চয় (১৩১৯) বিচিত্রপাঠ (১৯১৫) বা চতুর্থভাগ পাঠপ্রচয় (চৈত্র ১৩৩৬) গ্রন্থে 'য়ুরোপের ছবি' শিরোনামে "সাধু" ভাষায় রচিত যে ক্ষুদ্র নিবন্ধটি আছে তাহাও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র অল্প কয়েক দিনের বিবরণীর আংশিক সংকলন ও রূপান্তর মাত্র।

বর্তমান গ্রন্থে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ-যুগলের পাঠের অনুসরণে মুদ্রিত হইল।

উভয় খণ্ডের উৎসর্গপত্র অবিকল একরূপ ছিল— বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠায় সংকলিত।

পৃষ্ঠা

৮৪-৮৫ ১লা সেপ্টেম্বরের দিনলিপির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ('খসড়া'য় পৃ ১৫৪-৫৫) 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত (পৃ ১৫৬-৫৭) পত্রাংশের সহিত তুলনীয়।

১৩৩।২৪৩ ডিলনের অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের তারিখ মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি-চিত্রে, 'সাধনা'য় ও প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থে ৩রা নভেম্বর থাকিলেও, মূল দিনলিপিতে (বর্তমান গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ২রা নভেম্বর ছিল, ইহা তথ্য-সন্ধানী সুধীজন লক্ষ্য করিবেন।

১৩৭ 'কম্বল অপহরণ'। বিস্তারিত বিবরণ— ৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা।
স্বপ্ন। বিবরণ— ২৪৯ পৃষ্ঠা।

১৩৮ 'রুগ্ন বাপ— বেচারা'। বিবরণ— ২৫০ পৃষ্ঠা।

১৩৮ শেষ অনুচ্ছেদের সূচনা হইতে

১৩৯ প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত একই ভাবনা-সূত্রে গ্রথিত একটি প্রবন্ধ বলিলে হয়— ইহাই পরে আরও বিস্তার ও বিশদ করিয়া এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'-খণ্ড-রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, বর্তমান গ্রন্থে ১-৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত : অথচ, পাণ্ডুলিপিতে সমস্ত রচনাটি একই কালে অবিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই রচনার শেষাংশ, যে অংশ বর্তমান গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠার নূতন অনুচ্ছেদে শুরু হইয়াছে, তাহা ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের কয় ছত্র লেখার পর (এই গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠার শেষ) পাণ্ডুলিপির '৮ম পৃষ্ঠার আনুষঙ্গিক' এই মন্তব্য-পূর্বক খাতায় লেখা হইয়াছিল।

১৫৩-৫৪ কবি-কর্তৃক 'cancelled'-চিহ্নিত এই কবিতার 'ভালো-ব্যক্ত-না-হওয়া' ভাব, বিলাত হইতে ফিরিবার পথে লেখা অন্য একাধিক কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে বলা যায়। দ্রষ্টব্য 'মানসী' কাব্যের 'বিদায়' 'আমার সুখ' ইত্যাদি। ভাষাগত মিলও লক্ষণীয়।

বর্তমান গ্রন্থে, [ ] বন্ধনীর মধ্যে, যে অংশ পাণ্ডুলিপিতে অস্পষ্ট লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়

তাহারই অনুমিত পাঠ দেওয়া হইয়াছে ; একমাত্র ১৪৭ পৃষ্ঠার বন্ধনীবদ্ধ শব্দ-দুটি ইহার ব্যতিক্রম— খাতায় স্পষ্টই লেখা থাকিলেও কাটার চিহ্ন আছে। ১৭৫ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ ছত্রে 'সাজাতে ও সুন্দর' শব্দ কয়টির পরিত্যক্ত পূর্বপাঠ ছিল— 'গোছাতে ও নেত্রতৃপ্তিকর'।

'খসড়া ডায়ারি'র প্রতিদিনের লিখনের সূচনায় সর্বদাই তারিখ দেওয়া ছিল এমন নয়। পরম্পরাক্রমে ও 'শনিবার' 'রবিবার' ইত্যাদির উল্লেখে যে তারিখ স্থিরীকৃত হয় তাহা ঐরূপ উল্লেখের পরেই বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। অথচ, ১০ সেপ্‌টেম্বর (বুধবার) হইতে ১৩ অক্‌টোবর (সোমবার) পর্যন্ত (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৬৯-১৯২) তারিখগুলি ঐভাবে যথাক্রমে যথোচিত স্থলগুলিতে বসানো হয় নাই। ইহা মুদ্রণত্রুটি মাত্র, অন্য কোনো কারণ-সম্ভূত নহে।

ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৩৭ পৃষ্ঠায় '২২ অগস্ট্। শুক্রবার' লিখিয়া যে অনুচ্ছেদের সূচনা তাহাতে এবং তাহার পরবর্তী অনুচ্ছেদে মোট আট দিনের বিবরণ (২২-৩০ অগস্ট্ ১৮৯০) সংহতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

—

আমার বন্ধু । পৃ ৯৭, ৯৮ । সতু, তারকনাথ পালিতের পুত্র ও লোকেন্দ্রনাথের ভ্রাতা সত্যেন্দ্র ।

ইন্দু । রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী ।

একটি গুজরাটী । পৃ ১০৫-১০৬ । নারায়ণ হেমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থ গুজরাটীতে অনুবাদ করেন ।

কর্তাদাদামশায় । দ্বারকানাথ ঠাকুর ।

কুমুদ । কুমুদনাথ চৌধুরী ।

ছোটোবউ । পত্নী মৃণালিনী দেবী ।

জ্যোতিদাদা । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

জ্যোৎস্না । ভাগিনেয় শ্রীজ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন । প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র । দ্রষ্টব্য— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল -লিখিত 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর' প্রবন্ধ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬, ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠা ।

তারকবাবু । তারকনাথ পালিত ।

দাদা, মেজদাদা । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

নারায়ণ হেমচন্দ্র । ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'একটি গুজরাটী' । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ গুজরাটীতে অনুবাদ করেন ।

নোয়েল । ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ।

বাবি । ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ।

বেলি । কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতা ।

মিস শ । মিস শার্প্ ।

যোগেশ । যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ।

রানী । ইন্দুমতী দেবীর মধ্যমা কন্যা ।

লিল । তারকনাথ পালিতের কন্যা ।

লীলা । ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ।

শ্যাম । পৃ ১৩৭ । জাহাজের নাম ।

সঙ্গীবন্ধুটি । আমার বন্ধু । আমাদের বন্ধু । লোকেন্দ্রনাথ পালিত ।

সতু । দ্রষ্টব্য ‘আমার বন্ধু’ । লোকেন্দ্রনাথ পালিতের ভ্রাতা সত্যেন্দ্র ।

সুরি । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ।

সল্লি । স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ।

Mrs. Palit । তারকনাথ পালিতের পত্নী ।

Scott । প্রথমবার বিলাত গিয়া রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার স্কটের পরিবারে বাস করেন । দ্রষ্টব্য ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ -অন্তর্গত দশম পত্র ।

Voysey বা Rev. Charles Voysey । ইংলন্ডে Theistic Churchএর আচার্য । দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রী -বিরচিত ‘আত্মচরিত’ ।

—

বর্তমান গ্রন্থে তিনখানি রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল, তন্মধ্যে একখানিতে 'সঙ্গী বন্ধু' লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দেখা যাইতেছে। সব-কয়টি আলোকচিত্র ১৮৯০ খৃস্টাব্দের।

প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিচিত্র, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র যে পাণ্ডু-লিপি হইতে গৃহীত— তাহার বিষয় পূর্ববর্তী ২৬৩ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। মুদ্রিত প্রতিচ্ছবিতে যে বিশেষ texture দেখা যায় তাহার হেতু এই যে, এই প্রাচীন পাণ্ডুলিপির জীর্ণ পাতাগুলি সূক্ষ্মাংশুকের আবরণে সংরক্ষণ করিতে হইয়াছে।